কৃষি
(Agriculture)

ইউনিট ৫

ভূমিকা

মানুষের আদিমতম পেশার অন্যতম হলো কৃষি। বিশ্বের যেসব স্থানে কৃষিকাজের অনুকূল জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ামক রয়েছে সেসব অঞ্চলে কৃষিকাজ করা হয়। কৃষিকাজের বৈশ্বিক বিস্তরণে দেখা যায় যে, একেক অঞ্চল একেক ধরনের ফসলে সমৃদ্ধ। যেমন-কোথাওবা অধিক পরিমাণে ধান আবার কোথাওবা অধিক পরিমাণে গম উৎপাদিত হয়। ফসল উৎপাদন অর্থাৎ কোথায় কোন ফসল ভালো উৎপাদিত হবে সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সাথে রয়েছে কতিপয় আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত নিয়ামক। কৃষিকাজের নিয়ামকসমূহের মধ্যে অন্যতম জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, শ্রমিক, মূলধন, বাজার, বীজ, সার, কীটনাশক, পরিবহন ও যোগাযোগ, প্রযুক্তি প্রভৃতি। যেসব দেশ প্রযুক্তিতে উন্নত সেসব দেশে ফসল উৎপাদনের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান উপায় কৃষি। অনেক দেশ কৃষিতে সমৃদ্ধ। অনেক দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে উঠেছে কৃষিকে কেন্দ্র করে। এই ইউনিটে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্য ধান, গম, চা, মৎস্য, পশুপালন প্রভৃতির বৈশ্বিক বিন্যাস আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : কৃষি ও কৃষিকার্যের নিয়ামক
পাঠ-৫.২: ধান চাষ ও বিশ্বব্যাপী বন্টন
পাঠ-৫.৩ : গম চাষ ও বিশ্বব্যাপী বন্টন
পাঠ-৫.৪ : চা চাষ ও বিশ্বব্যাপী বন্টন
পাঠ-৫.৫ : বিশ্বের মৎস্যক্ষেত্র ও চাষ
পাঠ-৫.৬ : বিশ্বের পশুপালন

ব্যবহারিক

পাঠ-৫.৭ : স্তম্ভলেখ ও পাইচিত্রের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন প্রদর্শন ও প্রকৃতি ব্যাখ্যাকরণ

পাঠ-৫.১ কৃষি ও কৃষিকার্যের নিয়ামক (Agriculture and Factors of Agriculture)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষির সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- কৃষিকার্যের নিয়ামকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

কৃষি

মানুষের আদিমতম পেশার অন্যতম হলো কৃষি। এটি প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। মানব বসতি, মানব সভ্যতা এবং কৃষি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। বর্তমানে কৃষিকে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কৃষি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Agriculture যা ল্যাটিন শব্দ Agercultura থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। Agriculture শব্দটির আভিধানিক অর্থ শস্য উৎপাদনের নিমিত্তে ভূমি কর্ষণ। অর্থাৎ ভূমি কর্ষণ বা ভূমির চাষাবাদকেই কৃষি বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে, শস্যাদি উৎপাদন ও পশুপালন করে এ সকল উৎপাদনকে মানুষের ব্যবহার, বিক্রি ও বাজারজাতকরণের নিমিত্তে মৃত্তিকা কর্ষণের কলাকৌশল বা বিজ্ঞানই কৃষি। প্রখ্যাত ভূগোলবিদ Zimmerman বলেন, ''কৃষি হচ্ছে মানুষের ঐ সকল উৎপাদনশীল প্রচেষ্টা, যাতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে ভূমির নানাবিধ ব্যবহার অন্বেষণ করে এবং সম্ভব হলে উদ্ভিদ ও প্রাণির স্বাভাবিক জন্ম ও বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও উন্নয়ন ঘটায় অথবা নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভিদ ও প্রাণি স্বাভাবিক জন্ম বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় শস্য ও প্রাণিজ দ্রব্যাদি উৎপাদন করা। অর্থাৎ কৃষি হচ্ছে একটি মানবীয় কর্মকাণ্ড যা পরিকল্পিতভাবে ভূমি বা মৃত্তিকা ও পানিতে উদ্ভিদ ও প্রাণির ক্রমবিকাশ ঘটায় এবং খাদ্য, বস্ত্রসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করে থাকে''। কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকজনকে কৃষক নামে অভিহিত করা হয়। এটি খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ প্রক্রিয়াকে সচল রাখে।

কৃষিকার্যের নিয়ামক (Factors of Agriculture)

যেসব উপাদান দ্বারা কৃষিকাজ প্রভাবিত হয় সেগুলোকে কৃষিকাজের নিয়ামক বলে অভিহিত করা হয়। কৃষিকাজের এসব নিয়ামকসমূহকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় যা নিম্নের ছকে দেখানো হলো।

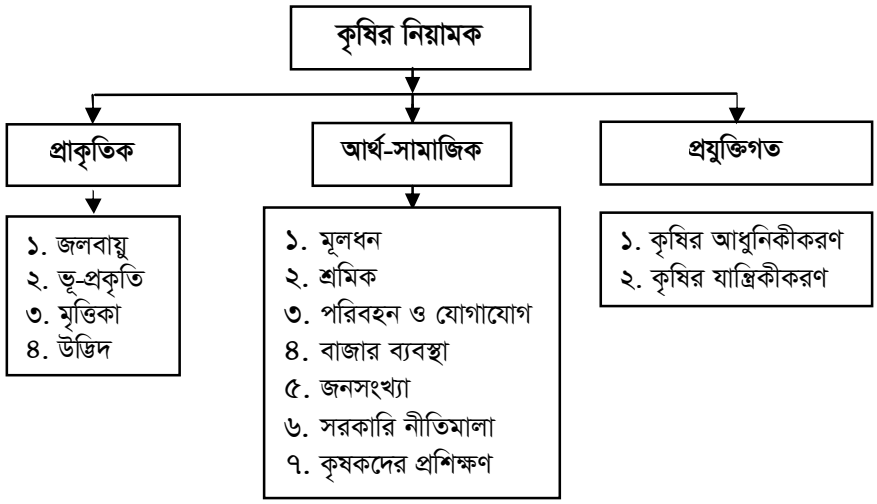

ক. **প্রাকৃতিক নিয়ামক (Physical Factors) :** প্রাকৃতিক নিয়ামকের উপর কৃষিকাজ এবং এর বিস্তরণ অনেকাংশেই নির্ভরশীল। নিম্নে এসব নিয়ামকসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. জলবায়ু (Climate) : আমরা জানি, কোনো একটি বৃহৎ অঞ্চলের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর ৩০-৪০ বছরের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি পদ্ধতি এবং কৃষি উৎপাদিত পণ্য জলবায়ু দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত জলবায়ুর উপাদানসমূহ হলো-

তাপমাত্রা (Temperature) : কৃষির ধরণ (আর্দ্র বা শুষ্ক), শস্যের প্রকৃতি (খাদ্যশস্য-ধান, গম বা ভুট্টা ইত্যাদি), চাষাবাদের সময়কাল (ঋতুগত-শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি) প্রভৃতি তাপমাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার উপরে বা নিচে চাষাবাদ করা যায় না। প্রতিটি ফসলের তাপ সহ্য করার ক্ষমতা একই রকম নয়। ফলে তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে বিশ্বের শস্য ভান্ডারসমূহ গড়ে উঠেছে। ক্রান্তীয় শস্যাদি যেমন খেজুর, কোকো গাছের জন্য সারা বছর উচ্চ শুষ্কতা প্রয়োজন। আবার ধান, পাট, আখ চাষের জন্য তুলনামূলক তাপমাত্রা কম প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাত (Rainfall) : ফসল উৎপাদনের জন্য বৃষ্টিপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ্টিপাতের অভাবে যেমন ভূমি কর্ষণ এবং ফসল উৎপাদন প্রায় অসম্ভব তেমনি অতিবৃষ্টি চাষাবাদের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। কৃষিকাজের জন্য মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত উপযুক্ত। তবে একেক ফসলের জন্য একেক মাত্রার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। যেমন-অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ধান, পাট এবং কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে গম ভালো উৎপাদিত হয়। তবে যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত তুলনামূলক অনেক কম থাকে সেসব অঞ্চলে সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা যায়।

আর্দ্রতা (Humidity) : আর্দ্রতার উপর ফসলের জন্ম ও বৃদ্ধি নির্ভরশীল। আর্দ্রতাহীন শুষ্ক অঞ্চলে কৃষিকাজে তেমন উন্নতি হয়না। ফলে স্থানভেদে বায়ুর আর্দ্রতার তারতম্যের জন্য কৃষিকাজেও তারতম্য ঘটে।

বায়ুপ্রবাহ (Wind Movement) : উদ্ভিদের আকার-আকৃতি, বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধনে বায়ুপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ু শুষ্ক ও অধিক গতি সম্পন্ন হলে মৃত্তিকার আর্দ্রতা কমে যায় এবং ফসলের ক্ষতি হয়। এছাড়া তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, বৃষ্টিপাত সংঘটন প্রভৃতিতে বায়ুপ্রবাহের প্রভাব রয়েছে।

২. ভূ-প্রকৃতি (Physiography) : কৃষিকার্যের অন্যতম নিয়ামক ভূ-প্রকৃতি। ভূমির অবস্থান, উচ্চতা, ঢাল, বন্ধুরতা ইত্যাদির উপর কৃষিকাজের ধরণ নির্ভর করে। খাড়া ঢাল, উচ্চভূমি বা পাহাড়, বন্ধুর ভূ-পৃষ্ঠ কৃষিকাজের জন্য অনুপযোগী। সমতল ভূমি কৃষিকাজের জন্য আদর্শ। যেমন-নিম্ন অথচ সমতল ভূমিতে ধান, পাট, গম এবং উঁচু ও ঢাল বিশিষ্ট ভূমি চা, কফি, রাবার প্রভৃতি চাষের জন্য উপযুক্ত।

৩. মৃত্তিকা (Soil) : মৃত্তিকার ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ, গঠন, ছিদ্রময়তা, প্রবেশ্যতা, অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব ইত্যাদি কৃষি কাজের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে থাকে। উর্বর মৃত্তিকায় ফসল ভালো উৎপাদিত হয় এবং অনুর্বর মৃত্তিকা কৃষিকাজের জন্য তেমন উপযুক্ত নয়। সাধারণত নদীবাহিত অঞ্চলে পলি সঞ্চয়ের ফলে উত্তম কৃষিকাজ হয়।

৪. উদ্ভিদ (Vegetation) : উদ্ভিদ কৃষিকাজের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উদ্ভিদ আচ্ছাদিত অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা কৃষিকাজের জন্য অপরিহার্য। আর উদ্ভিদ শূন্য এলাকায় বৃষ্টিপাত হয় না বলে পানিসেচ ব্যতীত ফসল উৎপাদন করা যায় না। এক্ষেত্রে আবার পানির উৎস থাকতে হয়।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক (Socio-economic Factors) : কৃষিক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহের প্রভাব মূলত একটি পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। কেননা, মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলেও বিকল্প উপায়ে কিছুটা হলেও কৃষিকাজ চালিয়ে নিতে পারে। যেমন-বৃষ্টিহীন অঞ্চলে পানিসেচের মাধ্যমে কৃষিতে সাফল্য অর্জন। নিম্নে কৃষির উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো :

১. মূলধন (Capital) : কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য মূলধন গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস পায়। কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, বীজ, সার ও কীটনাশক ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি, পরিবহন ব্যয় প্রভৃতি বাবদ অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এসব কারণে কৃষিতে পর্যন্ত মূলধন সরবরাহ থাকা উচিত।

২. শ্রমিক (Labour) : উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশসমূহের কৃষি মূলত শ্রমিক নির্ভর। শ্রমিকরা কৃষির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। কৃষি জমি প্রস্তুত, সেচ প্রদান, শস্যক্ষেত পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ ও মাড়াই প্রভৃতি কাজের জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। অধ্যাপক Morgan (১৯৬৯) বিভিন্ন কৃষি ঋতুর ভিত্তিতে পাঁচ ধরনের কৃষি শ্রমিকের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- ১. সাময়িক কৃষি শ্রমিক ২. খণ্ডকালীন কৃষি শ্রমিক ৩. চুক্তিবদ্ধ কৃষি শ্রমিক ৪. চাষাবাদকালীন অতিরিক্ত কৃষি শ্রমিক এবং ৫. সার্বক্ষণিক কৃষি শ্রমিক।

৩. পরিবহন ও যোগাযোগ (Transportation & Communication) : কৃষি উপকরণাদি কৃষিক্ষেত্রে আনা-নেওয়া, উৎপাদিত ফসল বাড়িতে আনা, পচনশীল দ্রব্য দ্রুত বাজারজাতকরণ প্রভৃতির জন্য সহজলভ্য ও উন্নত পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আবশ্যক।

৪. বাজার ব্যবস্থা (Market System) : উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। চাহিদা অনুসারে কৃষি পণ্য উৎপাদন করলে ভালো মুনাফা পাওয়া যায়। উৎপাদিত পণ্য ভোক্তার কাছে সহজে এবং সুলভে পৌঁছানোর জন্য উন্নত বাজার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৫. জনসংখ্যা (Population) : কোনো স্থানে জনসংখ্যার আকার বড় হলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বেশি থাকে। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, জনসংখ্যা কম হলে চাহিদা কম থাকে যা উৎপাদনে প্রভাব ফেলে।

৬. সরকারি নীতিমালা (Government Policy) : সরকারি নীতিমালার উপর কৃষি উৎপাদন নির্ভর করে। যেমন-সরকার শস্য সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে উৎপাদনকে সংকুচিত বা প্রসারিত করতে পারে। আবার কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে পারে।

৭. কৃষকদের প্রশিক্ষণ (Training of Farmers) : উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোর অধিকাংশ কৃষকের প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে না। এতে ফসলের উৎপাদন ও গুণগত মানের উপর প্রভাব পড়ে। এজন্য কৃষকদের সংগঠিত করে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে পারলে উৎপাদন এবং পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি করা সহজ হয়।

গ. প্রযুক্তিগত নিয়ামক (Technological Factors) : কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত নিয়ামকের ভূমিকা অপরিসীম। যেমন-

১. কৃষির আধুনিকীকরণ (Modernization of Agriculture) : কৃষিক্ষেত্রে সর্বত্র আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকীকরণ করা যায়। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হয়।

২. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ (Mechanization of Agriculture) : কৃষির উন্নয়নের জন্য যান্ত্রিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিকীকরণের ফলে মৃত্তিকার গভীর পর্যন্ত লাঙ্গল প্রবেশ করে মাটি আলগা হয়। ফলে শস্যের মূল সহজে মাটিতে প্রবেশ করতে পারে। পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, চাষাবাদের জন্য গরু ও মহিষের পরিবর্তে ট্রাক্টর ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কৃষিকার্যের জন্য ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত যে সকল নিয়ামক রয়েছে সেগুলোর সম্মিলিত ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব যা বিশ্বের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কৃষিকার্যের নিয়ামকসমূহ ছকবদ্ধ করুন এবং আপনার এলাকার প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

কৃষি মানুষের প্রাচীনতম পেশা। যা পরবর্তীতে মানুষকে বসতি স্থাপনে আগ্রহী করে তোলে এবং সভ্যতার শুরু হয়। কৃষি বলতে শস্যাদি উৎপাদন ও পশুপালন করে মানুষের ব্যবহার, বিক্রি ও বাজারজাতকরণের নিমিত্তে মৃত্তিকা কর্ষণের কলাকৌশল বা বিজ্ঞানকে বুঝায়। কতকগুলো প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত নিয়ামক রয়েছে যেগুলোর উপর কৃষি নির্ভরশীল। বিশেষ করে কোন অঞ্চলে কী ধরনের শস্য উৎপাদিত হবে তা প্রাকৃতিক নিয়ামক যেমন জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহের মধ্যে মূলধন, শ্রমিক, পরিবহন ও যোগাযোগ, বাজার ব্যবস্থা, জনসংখ্যা, সরকারি নীতি প্রভৃতির উপর কৃষির উন্নতি নির্ভরশীল। পাশাপাশি ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির চাহিদা পূরণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কৃষি কোন পর্যায়ের কর্মকাণ্ড?

(ক) প্রাথমিক (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

২। কৃষির প্রাকৃতিক নিয়ামক হলো-

i. ভূ-প্রকৃতি ii. জলবায়ু iii. মূলধন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কৃষিকাজে মূলধন কেন প্রয়োজন?

i. যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ii. পানিসেচে iii. বীজ ক্রয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.২ ধান চাষ ও বিশ্বব্যাপী বন্টন (Paddy Cullivation and its World Distribution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধান চাষের নিয়ামকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বিশ্বব্যাপী ধানের বন্টন জানতে পারবেন এবং
- চালের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ধান

ধান Oryza বর্গের তৃণজাতীয় দানাদার ফসল। এর বৈজ্ঞানিক নাম Oryza Sativa। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। ধানের খোসা ছাড়িয়ে চাল (Rice) তৈরি করা হয়। বহু শতাব্দী আগে থেকেই চালের ব্যবহার প্রচলিত। এটি শর্করা জাতীয় খাবার যা মানবদেহে শক্তি উৎপাদনে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। এতে সামান্য পরিমাণে প্রোটিন এবং স্নেহ পদার্থ রয়েছে। এটি প্রধানত মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের ফসল। অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা ধানের উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অববাহিকা, ইতালির পো নদীর অববাহিকা, দক্ষিণ আমেরিকার ওরিনকো নদীর অববাহিকা সুপ্রসিদ্ধ ধান উৎপাদক অঞ্চল।

ধান চাষের নিয়ামক (Favourable Factors of Paddy Cultivation) : ধান চাষে কতিপয় প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নিম্নে এসব নিয়ামক বর্ণনা করা হলো:

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক (Physical Factors)

১. জলবায়ু : ধান চাষে জলবায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ধান চাষের জন্য সাধারণত বার্ষিক ১০০-২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। যেসব স্থানে বার্ষিক ১৭৫-২২৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় সেখানে ধান অধিক উৎপাদন হয়। ১০০ সেন্টিমিটার এর কম বৃষ্টিপাত হলে সেচের প্রয়োজন হয়। ধান চাষের জন্য ১৮°-২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। ধান বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য ১৬° সেলসিয়াস এর অধিক তাপমাত্রা এবং চারা বৃদ্ধিকালীন সময়ে ২২°-২৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকা আবশ্যক। ধান পাকার সময় উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়।

২. ভূ-প্রকৃতি : ধান চাষের জন্য সমভূমি আদর্শ। সমভূমিতে আইল বেঁধে পানি আটকে রাখা সুবিধা হয়। চীন ও জাপানে পাহাড়ের গায়ে অপ্রশস্ত দীর্ঘ সমভূমি সৃষ্টির মাধ্যমে ধান চাষ করা হয় যা 'চত্বর কৃষি' নামে পরিচিত। সাধারণত নদী উপত্যকা এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী পলল সমভূমিতে ধানের উৎপাদন বেশি হয়।

৩. মৃত্তিকা : পলিযুক্ত এঁটেল ও এঁটেল-দোঁআশ মৃত্তিকা ধান চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। এ ধরনের মৃত্তিকা অধিক পরিমাণে পানি ধারণে সক্ষম। মৃত্তিকার অম্লাত্মক থেকে নিরপেক্ষ অবস্থা ধান চাষের অনুকূল। কিছুটা লবণাক্ত জমিতেও ধান জন্মাতে পারে।

৪. পানির সান্নিধ্য : ধান চাষের জন্য পর্যাপ্ত পানি প্রয়োজন। পানির ঘাটতি হলে উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। একারণে নদী, হ্রদ, হাওড়, বাওড় প্রভৃতি অঞ্চলের পাশে ধান অধিক উৎপাদিত হয়। বর্তমানে অধিকাংশ স্থানে শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গভর্স্থ পানি উত্তোলন করে সেচ দেয়া হয়।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক (Socio-economic Factors)

১. শ্রমিক : ধান চাষের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, রোপন, আগাছা পরিষ্কার, ফসল কাটা, সংগ্রহ, পরিবহন প্রভৃতি কাজের জন্য শ্রমিকের চাহিদা অধিক। এসব কারণে ঘন বসতিপূর্ণ এশিয়া মহাদেশের দেশসমূহে ধান চাষ অধিক হয়।

২. মূলধন : শ্রমিকের মজুরি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, সেচ, বীজ প্রভৃতির জন্য পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজন। তবে প্রান্তিক কৃষকেরা নিজে এবং পরিবারের সদস্যরা শ্রম দিয়ে থাকে বলে কম মূলধন হলেও চলে। ব্যাপকভিত্তিক ধান চাষে পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ করতে না পারলে উৎপাদনে প্রভাব পড়ে।

৩. পরিবহন : ধান চাষের বিভিন্ন উপকরণ আনা-নেওয়া, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতির জন্য সহজলভ্য ও উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৪. বাজার : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত ধান বিক্রির জন্য বাজার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে ধানের চাহিদা থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এতে কৃষক উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়।
৫. কৃষি উপকরণ : অধিক উৎপাদনের জন্য উন্নত বীজ, জৈব ও রাসায়নিক সার, পর্যাপ্ত সেচ ও কীটনাশক আবশ্যক। এছাড়া আধুনিক কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
৬. শস্য সংরক্ষণ ও গুদাম : সারা বছর ব্যবহারের জন্য ধান ভালোভাবে শুকিয়ে শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হয়। এজন্য পর্যাপ্ত গুদামঘর থাকা প্রয়োজন।
গ. প্রযুক্তিগত নিয়ামক (Technological Factors) : অধিক পরিমাণে ধান উৎপাদনের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণের বিকল্প নেই। ধান চাষে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিশ্বব্যাপী ধানের উৎপাদন ও বণ্টন : পৃথিবীর ধান উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলগুলো মূলত ৫০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় বলয়ে অবস্থিত। পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশে ধান উৎপাদিত হলেও এশিয়া মহাদেশে অধিকাংশ ধান উৎপন্ন হয়। আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় ধানের উৎপাদন তুলনামূলক অনেক কম। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের দেশগুলো ধান উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। সারণি ৫.২.১ এ ধান উৎপাদনকারী প্রধান দেশসমূহের জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন দেখানো হলো।

সারণি : ৫.২.১ বিশ্বের প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ ও উৎপাদন (২০১৫-১৬)

দেশের নাম	জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	উৎপাদনের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের শতকরা হার (%)
চীন	৩০.২১	১৪৫.৭৭	৩০.৮৯
ভারত	৪৩.৫০	১০৪.৪১	২২.১৩
ইন্দোনেশিয়া	১২.১০	৩৬.২০	৭.৬৭
বাংলাদেশ	১১.৭৫	৩৪.৫০	৭.৩১
ভিয়েতনাম	৭.৭০	২৭.৫৮	৫.৮৫
থাইল্যান্ড	৯.৪৪	১৫.৮০	৩.৩৫
মিয়ানমার	৬.৯০	১২.১৬	২.৫৮
ফিলিপাইন	৪.৫২	১১.০০	২.৩৩
জাপান	১.৫৯	৭.৬৭	১.৬৩
ব্রাজিল	২.০১	৭.২১	১.৫৩
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	০.৪৪	২.০৫	০.৪৩
অন্যান্য দেশ	২৮.৭৩	৬৭.৪৮	১৪.৩০
মোট	**১৫৮.৮৯**	৪৭১.৮৩	১০০.০০

উৎস : United States Department of Agriculture (USDA), 2017

বিশ্বের প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ : বিশ্বের প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো-
১. চীন : ধান উৎপাদনে চীন বিশ্বে প্রথম। উত্তর ও পশ্চিম চীনের পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত প্রায় সমগ্র চীনেই ধান উৎপাদিত হয়। চীনের হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ও সেচুয়ান অববাহিকা এবং হুনান প্রদেশে প্রচুর ধান জন্মে। অত্যধিক ধান উৎপাদিত হওয়ার কারণে হুনান প্রদেশকে 'পৃথিবীর ধানের আধার' (Rice Bowl of the World) বলা হয়। চীনের শতকরা ৯৫ ভাগ ধান নিম্নভূমিতে এবং ৫ ভাগ পার্বত্য এলাকায় উৎপন্ন হয়। পার্বত্য এলাকায় ধান উৎপাদনের জন্য প্রচুর সার প্রয়োগ করতে হয়। উর্বর পাললিক মৃত্তিকা, অনুকূল জলবায়ু, সুলভ শ্রমিক, পর্যাপ্ত মূলধন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্যাপক অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার ধান চাষ উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রতি হেক্টর জমিতে ৬.৮৯ টন ধান উৎপাদিত হয়।
২. ভারত : ধান উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এর উপর নির্ভরশীলতা অধিক। দেশের প্রায় সর্বত্র ধান উৎপাদিত হলেও গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, তামিলনাড়ু ও উড়িষ্যাতে বিপুল পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়। উড়িষ্যার পাহাড়ে এবং ছোট নাগপুরের মালভূমি অঞ্চলে উচ্চভূমির ধান চাষ করা হয়। ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক কম। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রতি হেক্টর জমিতে ৩.৬০ টন ধান উৎপাদিত হয়। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদের আধিক্য এর অন্যতম কারণ। সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদনও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদন কম হলেও অধিক পরিমাণ জমিতে আবাদ করায় চাল রপ্তানিতে ভারত বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী।

৩. ইন্দোনেশিয়া : ধান উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। দেশটির জাভা, সুমাত্রা ও বোর্নিও দ্বীপের আগ্নেয় ও পলিযুক্ত মৃত্তিকা ধান চাষের জন্য খুবই উপযোগী। জাভাতে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চ ঢালে চত্বর বিশিষ্ট ধান চাষ দেখা যায়। এছাড়া সুমাত্রা ও সেলিবিস দ্বীপভূমির পর্বত ঢালে পানিসেচের মাধ্যমে ধান চাষ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হেক্টর প্রতি ৪.৭১ টন ধান উৎপাদিত হয়।

৪. বাংলাদেশ : বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। ভারতের ন্যায় বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত দেশের প্রায় সর্বত্রই কমবেশি ধান উৎপাদিত হয়। বরিশাল, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, পটুয়াখালী, রাজশাহী ও রংপুর প্রভৃতি জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রতি হেক্টর জমিতে ৪.৭১ টন ধান উৎপাদিত হয়।

৫. ভিয়েতনাম : বিশ্বে ধান উৎপাদনে ভিয়েতনামের স্থান পঞ্চম। মেকং নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল, হং দো নদীর ব-দ্বীপ, টনকিং উপত্যকা, আন্নামের উপকূলবর্তী সমভূমি, টন্‌লিস্যাপ হ্রদ তীরবর্তী সমভূমি প্রধান ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হেক্টর প্রতি ৫.৭৩ টন ধান উৎপাদিত হয়।

৬. থাইল্যান্ড : ধান উৎপাদনে থাইল্যান্ড বিশ্বে ষষ্ঠ। এদেশের প্রায় সর্বত্রই ধান চাষ হয়। তবে মেনাম নদী উপত্যকায় সর্বাধিক ধান উৎপাদিত হয়। এদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রতি হেক্টর জমিতে মাত্র ২.৫৩ টন ধান উৎপাদিত হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম হওয়ায় থাইল্যান্ড চাল রপ্তানিতে দ্বিতীয়।

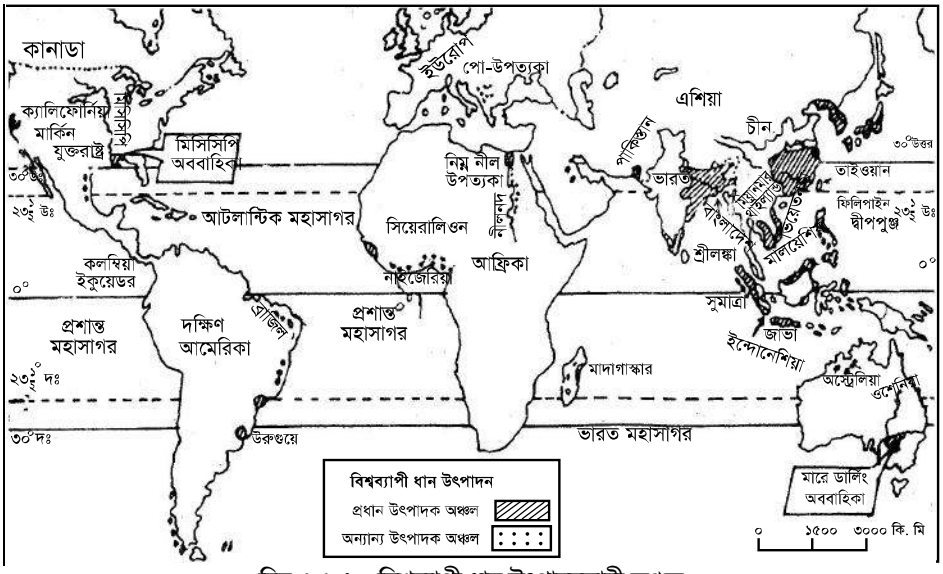

চিত্র ৫.২.১ : বিশ্বব্যাপী ধান উৎপাদনকারী অঞ্চল

৭. মিয়ানমার : মিয়ানমার ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে। ইরাবতী নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল, ব-দ্বীপ অঞ্চল, আরাকান উপকূল এবং উত্তর টেনাসেরিম ধান চাষের জন্য বিখ্যাত। দেশটিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রতি হেক্টর জমিতে ২.৭৫ টন ধান উৎপাদিত হয়।

৮. ফিলিপাইন : ধান উৎপাদনে ফিলিপাইন বিশ্বে অষ্টম। এদেশের প্রায় সর্বত্রই ধান চাষ হয়। লুজন দ্বীপ এলাকার সমভূমি এবং পাহাড়ি সোপান এলাকাতে অধিক ধান উৎপাদিত হয়। বর্তমানে হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদন ৩.৮৬ টন।

৯. জাপান : জাপান ধান উৎপাদনে বিশ্বে নবম অবস্থানে রয়েছে। হোক্কাইডা, হনসু, কিউসু ও কিকোকু অঞ্চল ধান উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানে ধান চাষের উপযুক্ত জমির পরিমাণ খুবই কম। তবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন অনেক বেশি। জাপানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল ৬.৬৪ টন।

১০. ব্রাজিল : ধান উৎপাদনে ব্রাজিল বিশ্বে দশম স্থানের অধিকারী। আমাজান নদীর উপত্যকা, সাওপাওলোর প্যারাইবা উপত্যকা, রিও জাকুহী উপত্যকা এবং রিওগ্রান্ডে দো-সুল প্রভৃতি এলাকায় অধিক ধান উৎপাদন হয়। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অর্ধেকের বেশি ধান ব্রাজিলে উৎপাদিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ধান উৎপাদন ছিল ৫.২৮ টন/হেক্টর ।

উপরিউক্ত দেশসমূহ ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, শ্রীলঙ্কা, লাওস, ফ্রান্স, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ধান উৎপাদন হয়। এছাড়া মিসর, নাইজেরিয়া, মাদাগাস্কার, মোজাম্বিক, সেনেগাল, কলম্বিয়া, পেরু, উরুগুয়ে, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে সামান্য পরিমাণে ধান উৎপাদিত হয়।

ধানের বিশ্ববাণিজ্য (World Trade of Rice) : পৃথিবীর অধিকাংশ ধান মৌসুমী জলবায়ুভুক্ত এশিয়ার দেশসমূহে উৎপাদিত হলেও বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজারের কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অবদান তুলনামূলক কম। সাধারণত জনবহুল দেশগুলো চাল আমদানি করে এবং কম জনসংখ্যার দেশসমূহ চাল রপ্তানি করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে চাল রপ্তানিতে ভারত প্রথম, থাইল্যান্ড দ্বিতীয়, ভিয়েতনাম তৃতীয় এবং পাকিস্তান চতুর্থ অবস্থানে ছিল। সারণি ৫.২.২ এ চালের রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্য দেখানো হলো।

সারণি ৫.২.২ : বিশ্বব্যাপী চালের রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্য ২০১৫-১৬ (মিলিয়ন টন)

রপ্তানি		আমদানি	
দেশ	**পরিমাণ**	**দেশ**	**পরিমাণ**
ভারত	১০.৪০	চীন	৪.৬০
থাইল্যান্ড	৯.৮৭	নাইজেরিয়া	২.৪০
ভিয়েতনাম	৫.০৯	আইভোরিকোস্ট	১.৩০
পাকিস্তান	৪.৩০	সৌদি আরব	১.৩০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩.৫৪	ইরান	১.১০
মিয়ানমার	১.৩০	ইন্দোনেশিয়া	১.০০
কম্বোডিয়া	১.১৫	সেনেগাল	০.৯৮
উরুগুয়ে	০.৯৯	দক্ষিণ আফ্রিকা	০.৯৫
ব্রাজিল	০.৬৪	ইরাক	০.৯৩
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	০.২৭	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	১.৮২
অন্যান্য দেশ	৩.০৭	অন্যান্য দেশ	২৪.২৪
মোট	**৪০.৬২**	**মোট**	**৪০.৬২**

উৎস : United States Department of Agriculture (USDA), 2017

শিক্ষার্থীর কাজ	ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহ মানচিত্রে দেখান।

সারসংক্ষেপ

ধান তৃণজাতীয় দানাদার ফসল। এটি পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠির প্রধান খাদ্যশস্য। ভৌগোলিক নিয়ামক অনুকূল থাকায় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত দেশসমূহ ধান চাষে প্রসিদ্ধ। এছাড়া আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহের মধ্যে পর্যাপ্ত শ্রমিক, অভ্যন্তরীণ বাজার, পরিবহণ এবং প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি ধান উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, ব্রাজিল, জাপান প্রভৃতি। তবে ধান উৎপাদনকারী প্রধান দেশসমূহের মধ্যে অনেক দেশ জনবহুল হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অবদান অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ধান উৎপাদনকারী যেসব দেশে জনসংখ্যা এবং চাহিদা কম সেসব দেশ অধিক পরিমাণে চাল রপ্তানি করে থাকে। যেমন-থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চীনের কোন প্রদেশকে ধানের আধার (Rice Bowl) বলা হয়?
(ক) হোয়াংহো (খ) হুনান (গ) সেচুয়ান (ঘ) ইয়াংসিকিয়াং

২। বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে বিশ্বে কততম স্থানের অধিকারী?
(ক) তৃতীয় (খ) চতুর্থ (গ) পঞ্চম (ঘ) ষষ্ঠ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বিশ্বে ধান উৎপাদনে এশিয়ার দেশগুলো প্রসিদ্ধ। আবার জনসংখ্যার দিক থেকেও বৃহত্তম। তবুও এশিয়ার দেশসমূহ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে রপ্তানিতে শীর্ষে অবস্থান করছে।

৩। কোন জলবায়ু অঞ্চলে অধিক ধান উৎপাদিত হয়?
(ক) নিরক্ষীয় (খ) ভূ-মধ্যসাগরীয় (গ) মৌসুমী (ঘ) মেরুদেশীয়

৪। চাল রপ্তানিকারক দেশ কোনটি?
i. ভারত ii. থাইল্যান্ড iii. ভিয়েতনাম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ গম চাষ ও বিশ্বব্যাপী বণ্টন (Wheat Cultivation and its World Distribution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গম চাষের নিয়ামকসমূহ বলতে পারবেন এবং
- বিশ্বব্যাপী গমের উৎপাদন ও বণ্টন বর্ণনা করতে পারবেন।

গম

দানা জাতীয় ফসলের মধ্যে গম অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য। এটি Graminae পরিবারভুক্ত ও Triticum সম্প্রদায়ভুক্ত ঘাস জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ। ধানের ন্যায় এটিও এক বর্ষজীবী উদ্ভিদ। চালের তুলনায় গম অধিকতর পুষ্টিকর খাবার। গমকে প্রক্রিয়াজাত করে আটা, ময়দা, সুজি, রুটি, পাউরুটিসহ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য তৈরি করা হয়।

গম চাষের নিয়ামকসমূহ (Factors of Wheat Cultivation) : গম চাষের অনুকূল নিয়ামকসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক (Physical Factors)

১. জলবায়ু : গম মূলত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের ফসল। এটি উষ্ণ অঞ্চলে শীতকালীন ফসল এবং শীতল অঞ্চলে বসন্তকালীন ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। গম চাষের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ১০°-২২° সেলসিয়াস। চারা বৃদ্ধির সময় ১০°-২০° সেলসিয়াস এবং পাকার সময় ২০°-২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রাকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয়। ধান চাষের ন্যায় গম চাষে অধিক পানির প্রয়োজন হয় না। সাধারণত যেসব অঞ্চলে ৩০-১০০ সেন্টিমিটারে বৃষ্টিপাত হয় সেসব অঞ্চলে গম ভালো জন্মে। গম চাষের শুরুতে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত এবং ফসল পাকা ও কাটার সময় রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া প্রয়োজন। গম চাষাবাদকালীন সময়ে বৃষ্টিপাত না হলে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়।

২. ভূ-প্রকৃতি : সমতল ভূমি গম চাষের জন্য উত্তম। তবে সামান্য ঢালু থেকে তরঙ্গায়িত জমিতেও গম ভালো জন্মে।

৩. মৃত্তিকা : গম চাষের জন্য কর্দম-দোআঁশ মৃত্তিকা অধিক উপযোগী। উর্বর জৈব সারযুক্ত দোআঁশ মৃত্তিকা গম চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত এবং গমের মানও উন্নত হয়। স্টেপস ও প্রেইরি অঞ্চলের কালো মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট মানের গম উৎপাদিত হয়।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক (Socio-economic Factors)

১. শ্রমিক : উন্নত দেশসমূহে গম চাষে আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে তুলনামূলকভাবে কম শ্রমিক প্রয়োজন হয়। এসব দেশসমূহের অধিকাংশই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চাষ করায় দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অধিক। তবে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে চাষাবাদে সনাতন পদ্ধতির প্রচলন অধিক থাকায় প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

২. মূলধন : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চাষ করলে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। বৃহৎ যন্ত্রপাতি, উন্নত বীজ, সার, সেচ প্রভৃতির জন্য পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে গম চাষে তুলনামূলক কম মূলধন লাগে এবং উৎপাদন কম হয়।

৩. বাজার : যেকোনো পণ্য উৎপাদনে বাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। গমের বৃহৎ আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে। এ কারণে বাজারের চাহিদার উপর গমের উৎপাদন নির্ভর করে।

৪. পরিবহন : গম উৎপাদনের সরঞ্জামাদি বহন এবং উৎপাদিত গম বাজারজাতকরণের জন্য সহজ ও সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চাষের ক্ষেত্রে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫. যন্ত্রপাতি : সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদে উন্নত যন্ত্রপাতি তেমন ব্যবহার করা হয় না। তবে বাণিজ্যিকভাবে গম চাষে অত্যাধুনিক ট্রাক্টর, কম্বাইনার, সিডার, হারভেস্টার প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এতে ফসল উৎপাদনের খরচ কম পড়ে এবং উৎপাদন অধিক হয়।

৬. কৃষি উপকরণ : অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য উন্নতমানের বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ প্রভৃতি যথাসময়ে এবং সুলভে নিশ্চিত করতে পারলে উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। এতে করে স্বল্প খরচে অধিক মুনাফা করা যায়।

৭. সংরক্ষণ সুবিধা : গম সহজে নষ্ট হয় না। তাই দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে বাজারজাত করা যায়। এক্ষেত্রে সাধারণত শুকনো গমে প্রতিষেধক ব্যবহার করে গুদামজাত করা হয়।

৮. সরকারি নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা : সরকারি নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা গম উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। সহজশর্তে ঋণ এবং কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদান করলে তা উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করে।

গ. প্রযুক্তিগত নিয়ামক (Technological Factors) : গম চাষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে গম চাষে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্বব্যাপী গমের উৎপাদন ও বণ্টন : গম মূলত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল হলেও পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কমবেশি উৎপাদিত হয়। উত্তর গোলার্ধের ২০°-৬০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দেশসমূহে সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলটি প্রধান 'গম উৎপাদনকারী বলয়' (Major Belt of Wheat) নামে পরিচিত। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চল বিপুল পরিমাণে গম উৎপাদনের জন্য 'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' (Bread Basket of the World) নামে পরিচিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিশ্বব্যাপী ২২৫.০৮ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ৭৩৭ মিলিয়ন টন গম উৎপাদিত হয়।

বিশ্বের গম উৎপাদনকারী দেশসমূহকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, অনেক দেশ শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য গম চাষ করে থাকে। যেমন-চীন, ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য। দ্বিতীয়ত, কতকগুলো দেশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে গম উৎপাদন করে থাকে। যেমন-কানাডা, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা। মহাদেশভিত্তিক গম উৎপাদনে এশিয়া বিশ্বে বৃহত্তম। দেশভিত্তিক গম উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে চীন। নিম্নে বিশ্বের প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশসমূহের বিবরণ দেওয়া হলো (সারণি ৫.৩.১) :

১. চীন : চীন বিশ্বে উৎপাদিত গমের ১৭.৬৭ শতাংশ উৎপন্ন করে থাকে। অন্যান্য দেশের তুলনায় হেক্টর প্রতি উৎপাদন এবং জমির পরিমাণ অধিক হওয়ায় গম উৎপাদনে শীর্ষে অবস্থান করছে। এখানে শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন উভয় প্রকার গম উৎপন্ন হয়। তবে উৎপাদিত গমের প্রায় ৯০% শীতকালীন। উত্তর চীনের সমভূমি, ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর অববাহিকা, সেচুয়ান অববাহিকা প্রভৃতি প্রধান গম উৎপাদনকারী অঞ্চল। অভ্যন্তরীণ চাহিদা অধিক থাকায় চীন প্রায় প্রতি বছর গম আমদানি করে থাকে।

২. ভারত : গম উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে গম অধিক উৎপাদিত হয়। এখানে মূলত শীতকালীন গম উৎপাদিত হয়। বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত গমের ১১.৭৪% ভারতে উৎপাদিত হয়।

৩. রাশিয়া : গম উৎপাদনে রাশিয়া বিশ্বে তৃতীয়। বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের ৮.২৮% রাশিয়ায় উৎপন্ন হয়। ভলগা নদীর অববাহিকা, ট্রান্স ইউরাল ও পশ্চিম সাইবেরিয়া, আমুর নদীর অববাহিকা, বৈকাল হ্রদ প্রভৃতি এলাকা রাশিয়ার গম উৎপাদনকারী প্রধান বলয়। রাশিয়ায় উৎকৃষ্ট মানের গম উৎপাদিত হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রাশিয়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে গম রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী ছিল।

৪. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের চতুর্থ গম উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের ৭.৬২% গম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। এদেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই গম উৎপাদিত হয়। তবে মন্টানা, মিনেসোটা, টেক্সাস, কানসাস, ওকলাহামা, মিসৌরী, উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা প্রভৃতি রাজ্যে সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গম রপ্তানিকারক দেশ।

সারণি ৫.৩.১ বিশ্বের গম উৎপাদনকারী দেশসমূহ (২০১৫-১৬)

দেশ	জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	উৎপাদনের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের শতকরা হার (%)	উৎপাদন (টন/হেক্টর)
চীন	২৪.১৪	১৩০.১৯	১৭.৬৭	৫.৩৯
ভারত	৩১.৪৭	৮৬.৫৩	১১.৭৪	২.৭৫
রাশিয়া	২৫.৫৮	৬১.০৪	৮.২৮	২.৩৯
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৯.১৫	৫৬.১২	৭.৬২	২.৯৩
কানাডা	৯.৫৮	২৭.৫৯	৩.৭৪	২.৮৮
ইউক্রেন	৭.১২	২৭.২৭	৩.৭০	৩.৮৩
পাকিস্তান	৯.২০	২৫.১০	৩.৪১	২.৭৩
অস্ট্রেলিয়া	১২.৮০	২৪.১৭	৩.২৮	১.৮৯
তুরস্ক	৭.৮৬	১৯.৫০	২.৬৫	২.৪৮
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	২৬.৮৩	১৬০.৪৮	২১.৭৬	৫.৯৮

উৎস : United States Department of Agriculture(USDA), ২০১৭

৫. কানাডা : গম উৎপাদনে কানাডা বিশ্বে প্রসিদ্ধ। প্রেইরি অঞ্চল, ম্যানিটোবা, সাসক্যাচিওয়ান রাজ্যে সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত গমের প্রায় ৯৫% এ তিনটি রাজ্যে উৎপন্ন হয়। এছাড়া ব্রিটিশ কলম্বিয়া, অন্টারিও রাজ্যেও গম উৎপাদিত হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় রপ্তানিতে বিশ্বে অন্যতম অবস্থানে রয়েছে কানাডা।

৬. ইউক্রেন : ইউক্রেন গম উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। নীপার ও নিস্টার নদীর অববাহিকা, খারকড ও কিয়েভ অঞ্চলে সর্বাধিক গম উৎপাদন হয়। এখানকার কৃষ্ণ মৃত্তিকা গম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে প্রচুর পরিমাণে গম রপ্তানি করে থাকে।

৭. পাকিস্তান : ভারতের ন্যায় পাকিস্তানেও শীতকালীন গম উৎপাদিত হয়। সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়। এছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও প্রচুর গম উৎপাদিত হয়। সাধারণত স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকাসমূহে পানিসেচের মাধ্যমে গম চাষ করা হয়। এখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য গম। ফলে গম চাষের জমির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে গম উৎপাদনে পাকিস্তান প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে কোনো কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হলে আমদানি করে থাকে।

৮. অস্ট্রেলিয়া : গম উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া অন্যতম। দেশটির মারে ডার্লিং নদীর ভিক্টোরিয়া অববাহিকা, নিউ সাউথ ওয়েলসের ডাউন্স সমভূমি এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া গম চাষে উন্নত। অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় প্রচুর পরিমাণে গম রপ্তানি করে থাকে। এখানে শীতকালীন গম উৎপাদিত হয়।

৯. তুরস্ক : তুরস্ক গম উৎপাদনে উন্নত। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত ইজমির ও আনাতোলী মালভূমি এবং ভূ-মধ্যসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে গম চাষ হয়।

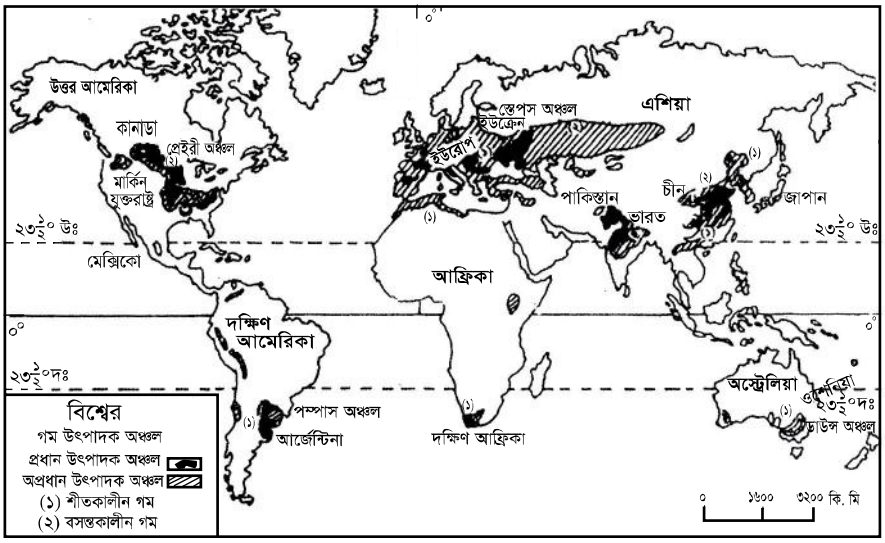

চিত্র ৫.৩.১ বিশ্বের গম উৎপাদনকারী অঞ্চল

১০. ইউরোপীয় ইউনিয়ন : ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৬.৮৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ১৬০.৪৮ টন গম উৎপাদন করে। এ জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে গম উৎপাদনে প্রসিদ্ধ ফ্রান্স এবং জার্মানি। গম উৎপাদনে ফ্রান্স বিশ্বে পঞ্চম। বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের প্রায় ৬% ফ্রান্সে উৎপন্ন হয়। দেশটির প্রায় সর্বত্রই গম চাষ হয়। তবে প্যারিস উপত্যকা এবং উত্তর পূর্ব ও পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপাদিত হয়। এদেশে বাণিজ্যিকভাবে গম চাষ হয়। ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় উৎপাদিত গমের বৃহৎ অংশ রপ্তানি করে। এছাড়া বিশ্বে উৎপাদিত গমের প্রায় ৩% জার্মানিতে উৎপাদিত হয়। দেশটির উত্তরাঞ্চলের সমতল ভূমি এলাকা এবং রাইন নদীর অববাহিকা গম উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। গম চাষে অন্তর্ভুক্ত জমির পরিমাণ কম হলেও হেক্টর প্রতি উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করেও প্রচুর গম রপ্তানি করে থাকে।

উপরিউক্ত দেশসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশ, কাজাখিস্তান, সাইবেরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, ইরাক, সৌদি আরব, আফগানিস্তান, যুক্তরাজ্য, ইতালি, গ্রিস, বেলজিয়াম, আর্জেন্টিনা, মিশর প্রভৃতি দেশে গম উৎপাদিত হয়।

গমের বিশ্ব বাণিজ্য (World Trade of Wheat) : মানুষের খাদ্যশস্যসমূহের মধ্যে অন্যতম গম। বর্তমানে বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষের প্রধান খাদ্য গম। একারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গম রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে রাশিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ফ্রান্স, কাজাখস্তান অন্যতম। অধিকাংশ দেশে উৎপাদিত গমের বড় অংশই অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করতেই শেষ হয়ে যায়। গম রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে কোনো কোনোটি আবার সামান্য পরিমাণে আমদানিও করে থাকে। অনুকূল ভৌগোলিক উপাদান না থাকায় বিশ্বের সব দেশ গম উৎপাদন করতে পারে না। অধিকাংশ দেশ অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য গম আমদানি করে থাকে। উন্নত দেশসমূহে অধিক পরিমাণ গম উৎপাদিত হওয়ায় উন্নয়নশীল দেশসমূহ এসব দেশ থেকে গম আমদানি করে। গম

আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে মিশর, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, মরক্কো, নাইজেরিয়া অন্যতম (সারণি ৫.৩.২)।

সারণি ৫.৩.২ : বিশ্বব্যাপী গমের রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্য ২০১৫-১৬ (মিলিয়ন টন)

রপ্তানি		আমদানি	
দেশ	**পরিমাণ**	**দেশ**	**পরিমাণ**
রাশিয়া	২৫.৫৪	মিশর	১১.৯৩
কানাডা	২২.১৪	ইন্দোনেশিয়া	১০.১২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২১.৮৬	আলজেরিয়া	৮.১৫
ইউক্রেন	১৭.৪৩	ব্রাজিল	৫.৯২
অস্ট্রেলিয়া	১৫.৭৮	জাপান	৫.৭২
আর্জেন্টিনা	৮.৭৫	ফিলিপাইন	৪.৮৫
কাজাখস্তান	৭.৬০	মেক্সিকো	৪.৮১
তুরস্ক	৫.৬১	বাংলাদেশ	৪.৬৯
মেক্সিকো	১.৫৭	মরক্কো	৪.৫০
সাইবেরিয়া	০.৮৮	নাইজেরিয়া	৪.৪১
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৩৪.৬৯	ইউরোপীয় ইউনিয়ন	৬.৯২
অন্যান্য দেশ	১০.২২	অন্যান্য দেশ	১০০.০৫
মোট	**১৭২.০৭**	**মোট**	**১৭২.০৭**

উৎস : United States Department of Agriculture (USDA), 2017

শিক্ষার্থীর কাজ	গম চাষের নিয়ামকসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

দানা জাতীয় ফসলসমূহের মধ্যে গম অন্যতম। এটি শীতপ্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ উভয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান ফসল। গম চাষের কতগুলো প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক নিয়ামক রয়েছে। এসব নিয়ামক যেসব দেশ বা অঞ্চলে অনুকূল সেসব দেশ বা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে গম উৎপাদিত হয়। গম উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চীন, ভারত, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউক্রেন, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া। গম উৎপাদনকারী যেসব দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা তুলনামূলক কম সেসব দেশ চাহিদা পূরণ করে বিশ্ববাজারে রপ্তানি করে থাকে। রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে রাশিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউক্রেন, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, ফ্রান্স, কাজাখস্তান অন্যতম। অন্যদিকে আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, মেক্সিকো, বাংলাদেশ, মরক্কো, নাইজেরিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন মহাদেশে সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়?
(ক) এশিয়া (খ) আফ্রিকা (গ) ইউরোপ (ঘ) উত্তর আমেরিকা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ থেকে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পৃথিবীর শীতপ্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রধান ফসল গ্রামিনি গোত্রভুক্ত এক প্রকার ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ। এটি এক বর্ষজীবি উদ্ভিদ। যা প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

২। উদ্দীপকে উল্লিখিত ফসলটির নাম কী?
(ক) ধান (খ) গম গ) ভুট্টা (ঘ) যব

৩। আলোচ্য ফসলটি থেকে প্রস্তুত করা হয়-
i. রুটি ii. ময়দা iii. সুজি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। উল্লিখিত ফসলটি উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম কোন দেশ?
(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (খ) ভারত (গ) চীন (ঘ) রাশিয়া

পাঠ-৫.৪ চা চাষ ও বিশ্বব্যাপী বণ্টন (Tea Cultivation and its World Distribution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চা চাষের অনুকূল নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে জানবেন;
- বিশ্বব্যাপী চায়ের উৎপাদনকারী দেশসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন এবং
- চায়ের বিশ্ববাণিজ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

চা

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পানীয় হিসেবে চা একটি পরিচিত নাম। সুস্বাদু, সস্তা এবং হালকা পানীয় হিসেবে চায়ের কদর বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। এটি ক্যামেলিয়া গোত্রের দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Camellia Sinensis। খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩৭ অব্দে চীন দেশে প্রথম চা আবিষ্কৃত হয় বলে জানা যায়। চা গাছ সাধারণত ৯ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। তবে পাতা সংগ্রহের সুবিধার্থে ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার উঁচুতে ছেঁটে দেওয়া হয়। চা গাছের পাতা ও কুড়ি সংগ্রহের পর তা প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাত করা হয়। চা পানের ফলে শরীর ও মন সতেজ থাকে। সাধারণত গাছ লাগানোর ৫ বছর পর থেকে নিয়মিত পাতা সংগ্রহ করা যায় এবং এভাবে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত ভালো ফলন পাওয়া যায়। ভালোভাবে পরিচর্যা করলে আরো অধিক সময় পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। চা বাগানে রোপনকৃত ছায়াবৃক্ষসমূহ মূল্যবান কাঠ হিসেবে বিক্রি করা যায়।

চা চাষের নিয়ামক (Factors of Tea Cultivation) : চা চাষের কতকগুলো প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত নিয়ামক রয়েছে। নিম্নে এসব নিয়ামক বর্ণনা করা হলো:

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক (Physical Factors)

১. জলবায়ু : চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বিশেষ উপযোগী। সাধারণত যেসব স্থানে ২৬°-২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকে সেসব স্থান চা চাষের উপযুক্ত। গাছের বৃদ্ধিকালীন সময়ে ২০° সেলসিয়াস এর অধিক তাপমাত্রা প্রয়োজন। চা চাষের জন্য বার্ষিক ২০০ সেন্টিমিটার এর অধিক বৃষ্টিপাত এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৭০-৯০% আবশ্যক। অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি বা খরা কোনোটিই চা গাছের জন্য উপযুক্ত নয়। চা গাছের জন্য যেমন প্রচুর পানি প্রয়োজন তেমনি উপযুক্ত নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও থাকতে হয়।

২. ভূ-প্রকৃতি : প্রায় সমুদ্র সমতলে চা জন্মালেও উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে উন্নত মানের চা জন্মে। উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে পানি নিষ্কাশন দ্রুত হয় বলে পৃথিবীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট চা বাগান উচ্চভূমিতে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চা গাছের উচ্চতা চায়ের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। সাধারণত ৮০৬-১৯৩৫ মিটার উচ্চতায় চা সবচেয়ে ভালো উৎপাদিত হয়।

৩. মৃত্তিকা : পলি-দোঁআশ থেকে বেলে-দোঁআশ মৃত্তিকায় চা জন্মাতে পারে। তবে বেলে-দোঁআশ মৃত্তিকা চা চাষের জন্য সর্বোত্তম। কিছুটা এটেল জাতীয় মৃত্তিকাতেও চা জন্মাতে পারে। হালকা অম্লাত্বক মৃত্তিকা চা চাষের উপযোগী। চা চাষের জন্য মৃত্তিকার আদর্শ অম্লতা ৪.৫-৫.৮ পর্যন্ত। মৃত্তিকা পুষ্টিমান সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

৪. ছায়াবৃক্ষ : চা গাছকে প্রখর সূর্যতাপ এবং ঝড়-বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী ও অস্থায়ী বৃক্ষরোপন করা হয় যা ছায়াবৃক্ষ নামে পরিচিত। পর্যাপ্ত ছায়াযুক্ত বাগানে গাছের পাতা সতেজ থাকে এবং রোগ ও পোকার আক্রমণ তুলনামূলক কম হয়। ছায়াবৃক্ষের পাতা বাগানে পড়ে পচে জৈব পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

খ. আর্থ-সামাজিক নিয়ামক (Socio-economic Factors)

১. শ্রমিক : চা শ্রমঘন শিল্প হিসেবে পরিচিত। চা বাগানের জমি প্রস্তুত, চারা তৈরি ও রোপন, গাছের পরিচর্যা, নির্দিষ্ট সময়ে পাতা তোলা, প্রক্রিয়াজাত করা প্রভৃতি কাজে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়। বাগানের প্রায় সব কাজ কায়িক শ্রমের উপর

নির্ভরশীল। এসব কারণে কায়িক শ্রমে সক্ষম শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সস্তা ও সুলভ শ্রমিক এ শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২. মূলধন : চা চাষের জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করা হয় বলে জমি প্রস্তুত, চারা, শ্রমিকের মজুরি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, বাসস্থান প্রভৃতি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

৩. পরিবহন ও যোগাযোগ সুবিধা : চা পাতা সংগ্রহ করে কারখানায় পৌঁছানো এবং বাজারে সরবরাহের জন্য সুলভ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আবশ্যক। বিশ্বের অধিকাংশ চা বাগান পার্বত্য এলাকায় হওয়ায় অনুকূল পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

৪. চারা তৈরি : অন্যান্য কৃষি আবাদের তুলনায় চা বাগানের জন্য চারা বিশেষ যত্ন সহকারে তৈরি করতে হয়। চায়ের চারার গুণগত মান ফলন সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। অধিক ফলন এবং ভালো মানের পাতার জন্য ভালো চারা তৈরি করতে হয়।

৫. সার ও কীটনাশক : চা বাগানের মৃত্তিকায় নাইট্রেট এবং অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি পূরণে পর্যাপ্ত সার প্রয়োগ করতে হয়। বাগানে ক্ষতিকর পোকা আক্রমণ করলে উৎপাদন কমে যায়। গাছের রোগবালাই দমনের জন্য বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রোগবালাই নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মতো পর্যাপ্ত সার ও কীটনাশক সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়।

৬. পাতা চয়ন : চা গাছ থেকে সাধারণত 'দুটি পাতা এবং একটি কুড়ি' (Two Leaves and a Bud) চয়ন করা হয়। এতে চায়ের গুণগত মান ভালো হয়। অনেক সময় দুইয়ের অধিক পাতা ও কুড়ি চয়ন করা হয় যা গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। এ কারণে সঠিক নিয়মে পাতা চয়নে করতে হয় এবং এতে অধিক শ্রমিক প্রয়োজন হয়।

৭. বাজার : উৎপাদিত চা বিক্রির জন্য অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বর্তমানে বিশ্বে চা উৎপাদনকারী দেশসমূহের উৎপাদিত চায়ের বৃহৎ অংশই নিজেরা ভোগ করে থাকে। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিবছর চায়ের পর্যাপ্ত চাহিদা থাকে।

গ. প্রযুক্তিগত নিয়ামক (Technological Factors) : চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই। বিশেষ করে পানিসেচ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, আগাছা দমন, উন্নত মানের কারখানা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গুণগতমান বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের চা উৎপাদনকারী অঞ্চল : ২০১৫ সালে বিশ্বে চা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫,৩০৫ মিলিয়ন কেজি। এন্টার্কটিকা মহাদেশ ব্যতীত অন্যান্য সকল মহাদেশে চা উৎপাদিত হয়। মহাদেশভিত্তিক চা উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী এশিয়া। এশিয়ার পরেই আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থান। নিম্নে বিশ্বের প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশসমূহ বর্ণনা করা হলো-

১. চীন : বিশ্বের প্রাচীনতম চা উৎপাদনকারী দেশ চীন। দেশটি বর্তমানে চা উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম। তবে অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যাপক। ইয়াংসিকিয়াং নদীর দক্ষিণে অবস্থিত সিচুয়ান, হুনান, আনহুই, ফুকিয়েন, ইউনান প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। পাহাড় এবং পর্বতের ঢালে ৩০০ থেকে ৯০০ মিটার উঁচুতে পর্যন্ত চা বাগান রয়েছে। এদেশে উৎপাদিত চা তুলনামূলক নিম্নমানের এবং হেক্টর প্রতি ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব কম। চীনে প্রধানত পাঁচ ধরনের চা প্রস্তুত করা হয়। যথা-কালো চা, সবুজ চা, জেসমিন চা, ওলো চা এবং ইস্টক চা।

২. ভারত : ১৮২৩ সালে ভারতের আসামে প্রথম চা গাছ আবিষ্কার করেন রবার্ট ব্রুস। বর্তমানে দেশটি চা উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়। চা উৎপাদনকারী রাজ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরালা, ত্রিপুরা, অরুনাচল, হিমাচল, কর্ণাটক, সিকিম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, উড়িষ্যা, বিহার প্রভৃতি। ভারতের এদেশে উৎপাদিত চায়ের প্রায় অর্ধেকই আসামে উৎপন্ন হয়। দার্জিলিং এ উৎপাদিত চা বিশ্বখ্যাত। এখানকার চা বাগানগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ থেকে ১,২০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত। এদেশে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ উভয় প্রকার চা বাগান রয়েছে। উৎপাদিত চায়ের অধিকাংশই অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য ব্যবহার করে। ২০১৫ সালে চা রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানের অধিকারী ভারত।

৩. কেনিয়া : বিশ্বের তৃতীয় প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশ কেনিয়া। তবে রপ্তানিতে প্রথম স্থানের অধিকারী। দেশটির প্রধান চা উৎপাদনকারী অঞ্চল গ্রেট রিফট উপত্যকা এবং বিষুবরেখার দু'পাশে সমুদ্র সমতলের ১৫০০-২৭০০ মিটার উচুতে অবস্থিত। এখানে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ উভয় প্রকার চা বাগান রয়েছে।

সারণি ৫.৪.২ : বিশ্বের প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশ এবং উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)

দেশ	উৎপাদনের পরিমাণ (প্রায়)	দেশ	উৎপাদনের পরিমাণ
চীন	২,২৭৮	ভিয়েতনাম	১৭০
ভারত	১,২০৯	ইন্দোনেশিয়া	১২৯
কেনিয়া	৩৯৯	আর্জেন্টিনা	৮৩
শ্রীলঙ্কা	৩২৯	জাপান	৭৬
তুরস্ক	২৫৯	বাংলাদেশ	৬৭

উৎস : ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটি (আইটিসি), ২০১৬ এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড, ২০১৭

৪. শ্রীলঙ্কা : বিশ্বের অন্যতম চা উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ শ্রীলঙ্কা। উৎপাদনের তুলনায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় রপ্তানিতে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে রয়েছে। পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রায় সারা বছরই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের জন্য বিশ্বের একমাত্র শ্রীলঙ্কাতেই সপ্তাহে দুইবার চা পাতা চয়ন করা হয়। দেশটির পুরাতন রাজধানী কান্ডির আশেপাশে উচ্চ পাহাড়ি অঞ্চলে চা বাগানগুলো অবস্থিত।

৫. তুরস্ক : তুরস্ক বিশ্বে চা উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে পঞ্চম স্থানের অধিকারী। দেশটির অধিকাংশ চা বাগান টরাস পর্বতের দক্ষিণ ঢালে এবং আনাতোলিয়া মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। তুরস্কে জন প্রতি চা পানের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

৬. ভিয়েতনাম : ভিয়েতনাম চা উৎপাদনে বিশ্বে ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী। দেশটি অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে চা রপ্তানি করে থাকে।

৭. ইন্দোনেশিয়া : চা উৎপাদনে বিশ্বে ইন্দোনেশিয়া সপ্তম। জাভা দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে লাভা সঞ্চয়জাত উর্বর মৃত্তিকা বিশিষ্ট আগ্নেয় পর্বতগুলোর ঢালু পাদদেশে অধিকাংশ চা বাগান অবস্থিত। এছাড়া সুমাত্রার উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল, বোর্ণিও দ্বীপের মধ্যভাগের উচ্চভূমি, টিমোর দ্বীপের ডিলি এলাকায় চা বাগান অবস্থিত। দেশটি অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে চা রপ্তানি করে।

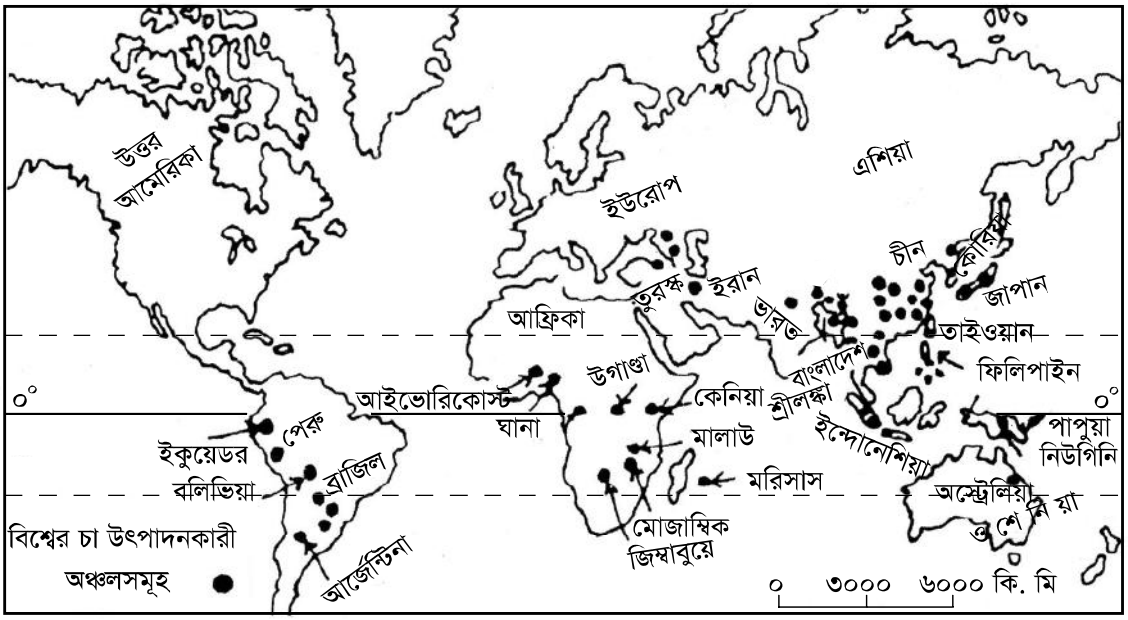

চিত্র ৫.৪.১ : বিশ্বের চা উৎপাদনকারী অঞ্চল

৮. আর্জেন্টিনা : আর্জেন্টিনা চা উৎপাদনে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে প্রথম এবং বিশ্বে অষ্টম স্থানের অধিকারী। ২০১৫ সালে প্রায় ৮৩ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়। দেশটির ল্যাপারান উপত্যকায় চা বাগানগুলো অবস্থিত।

৯. জাপান : জাপান চা উৎপাদনে বিশ্বে নবম। এখানকার চা বাগানগুলোতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চা চাষ করা হয়। প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং আধুনিক প্রযুক্তি হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিকোকু, হনসু ও কিউসু প্রদেশের পর্বতমালার পূর্ব ঢালে চা বাগানগুলো অবস্থিত। অভ্যন্তরীণ চাহিদা অধিক হওয়ার কারণে জাপান প্রায় প্রতি বছর বিশ্ববাজার থেকে চা আমদানি করে থাকে। জাপানীদের জাতীয় পানীয় চা।

১০. বাংলাদেশ : ২০১৫ সালে চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দশম। চা বাগানগুলো সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, পঞ্চগড় এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় অবস্থিত। পঞ্চগড় এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় বৃহৎ বাগানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র চা বাগান গড়ে উঠেছে। এছাড়া নীলফামারী, লালমনিরহাট, বান্দরবান প্রভৃতি জেলায় ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ শুরু হয়েছে। পূর্বে বাংলাদেশ অন্যতম চা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি বছর আমদানি করে থাকে।

১১. অন্যান্য দেশ : চা উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে ব্রাজিল, ইরান, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়া, মালাউ, পেরু, আইভোরিকোস্ট, ঘানা, মোজাম্বিক অন্যতম।

চায়ের বিশ্ববাণিজ্য : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চায়ের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সব দেশ চা উৎপাদনকারী না হলেও প্রায় সব দেশেই চায়ের চাহিদা রয়েছে। সাধারণত উন্নত দেশগুলোই চায়ের প্রধান ক্রেতা। ২০১৫ সালে উৎপাদিত চায়ের প্রায় ১,৮০০ মিলিয়ন কেজি (প্রায় ৩৪%) আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে। এ সময় বিশ্বে চা রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে কেনিয়া প্রথম, চীন দ্বিতীয়, শ্রীলঙ্কা তৃতীয় এবং ভারত চতুর্থ অবস্থানে ছিল। এছাড়া অন্যান্য চা রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, তানজানিয়া, উগান্ডা, মালাউ, মোজাম্বিক, বাংলাদেশ প্রভৃতি। আমদানিকারক দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিশর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, ইরাক, ইরান, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, কানাডা, তাইওয়ান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশও চা আমদানি শুরু করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	চা উৎপাদনকারী দেশসমূহের অবস্থান পৃথিবীর মানচিত্রে দেখান।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় পানীয় চা। এটি চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, পলি-দোঁআশ থেকে বেলে-দোঁআশ মৃত্তিকা, পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সুলভ ও দক্ষ শ্রমিক, মূলধন, বাজার প্রভৃতি নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের চা উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে চীন, ভারত, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, জাপান, বাংলাদেশ অন্যতম। ২০১৫ সালে বিশ্বে প্রায় ৫,৩০৫ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে প্রায় ১,৮০০ মিলিয়ন কেজি চা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে। অবশিষ্ট চা উৎপাদনকারী দেশসমূহ ভোগ করে। চা রপ্তানিতে কেনিয়া বিশ্বে প্রথম, চীন দ্বিতীয়, শ্রীলঙ্কা তৃতীয় এবং ভারত চতুর্থ অবস্থানের অধিকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চা উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম কোন দেশ?
(ক) ভারত (খ) কেনিয়া (গ) চীন (ঘ) বাংলাদেশ

২। ২০১৫ সালে চা রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম কোন দেশ?
(ক) শ্রীলঙ্কা (খ) কেনিয়া (গ) চীন (ঘ) ভারত

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

চীন দেশে প্রথম চা আবিষ্কৃত হয় বলে জানা যায়। বর্তমানে এটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় পানীয়। বিশ্বের বহু দেশে চা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশও অন্যতম চা উৎপাদনকারী দেশ।

৩। খ্রিস্টপূর্ব কত অব্দে বিশ্বে প্রথম চা আবিষ্কৃত হয় বলে ধারণা করা হয়?
(ক) ২৬৩৭ অব্দে (খ) ২৭৩৭ অব্দে
(গ) ২৮৩৭ অব্দে (ঘ) ২৯৩৭ অব্দে

৪। চা চাষের প্রাকৃতিক নিয়ামক হলো-
i. বৃষ্টিপাত ii. তাপমাত্রা iii. মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ বিশ্বের মৎস্যক্ষেত্র ও চাষ (Fishing Grounds and Pisciculture of the World)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিশ্বব্যাপী মৎস্যের উৎসসমূহ বলতে পারবেন;
- প্রধান মৎস্যক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- মৎস্য চাষ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মৎস্য

মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রাচীনতম উৎস মৎস্য। তখনকার দিনে মানুষ কেবল খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য মৎস্য শিকার করলেও বর্তমানে বিশ্বের বহু মানুষ মৎস্যক্ষেত্রসমূহ থেকে মৎস্য শিকার এবং মৎস্য চাষের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে (সারণি ৫.৫.১)। যে সকল দেশে মৎস্যক্ষেত্র এবং মৎস্য চাষের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে সে সকল দেশের মানুষের কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক দেশ মৎস্য শিল্পে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে এবং মৎস্যক্ষেত্রসমূহ সংরক্ষণ ও মৎস্য চাষ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সারণি ৫.৫.১ : বিশ্বব্যাপী মৎস্য শিকারী এবং মৎস্য চাষীর সংখ্যা

মহাদেশ ও অঞ্চল	সংখ্যা (মিলিয়ন)
আফ্রিকা	৫.৬৭
এশিয়া	৪৭.৭৩
ইউরোপ	০.৪১
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারাবিয়ান অঞ্চল	২.৪৪
উত্তর আমেরিকা	০.৩৩
অস্ট্রেলিয়া	০.০৫
মোট	**৫৬.৬৩**

উৎস : Food and Agricultural Organization (FAO), 2016

মৎস্যের উৎস (Sources of Fish) : পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৭১%) পানিরাশি দ্বারা আবৃত। এই বিশাল পানিরাশির অধিকাংশই ধারণ করছে সমুদ্র। অবশিষ্ট পানি রয়েছে নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ, পুকুর এবং অন্যান্য জলাশয়ে। এ সকল উৎস থেকে যেসব মাছ ধরা হয় সেগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. স্বাদু পানির মৎস্য এবং

খ. সামুদ্রিক মৎস্য (সারণি ৫.৫.২)।

ক. স্বাদু পানির মৎস্য : বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ, পুকুর, হাওড়, বাওড়সহ অন্যান্য জলাশয় থেকে যেসব মৎস্য পাওয়া যায় সেগুলো স্বাদু পানির মৎস্য হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের মৎস্য প্রধানত দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বাদু পানির মৎস্যসমূহের মধ্যে রয়েছে রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল, শোল, কই, মাগুর, শিং, টাকি ইত্যাদি। ভারত, বাংলাদেশ, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান এবং ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে স্বাদু পানির মৎস্য পাওয়া যায় (সারণি ৫.৫.৩)।

সারণি ৫.৫.২ : অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)

সাল	অভ্যন্তরীণ উৎস	সামুদ্রিক উৎস
২০১৪	১১.৩৪	৭৯.৮০
২০১৫	১১.৪৭	৮১.১৬
মোট	**২৩.৮১**	**১৬০.৯৬**

উৎস : Food and Agricultural Organization (FAO), 2017

খ. সামুদ্রিক মৎস্য : সমুদ্রে যেসব মৎস্য পাওয়া যায় সেগুলো সামুদ্রিক মৎস্য। বিশ্বের ধৃত মৎস্যের অধিকাংশই সামুদ্রিক হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বের অনেক দেশ সমুদ্র থেকে মৎস্য শিকার করে। এসব দেশের মধ্যে অন্যতম হলো চীন, ইন্দোনেশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পেরু, রাশিয়ান ফেডারেশন, ভারত, জাপান প্রভৃতি (সারণি ৫.৫.৩)।

সারণি ৫.৫.৩ : অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের পরিমাণ-২০১৫ (মিলিয়ন টন)

অভ্যন্তরীণ মৎস্য শিকার		সামুদ্রিক মৎস্য শিকার	
চীন	২.২৮	চীন	১৫.৩১
ভারত	১.৩৫	ইন্দোনেশিয়া	৬.০৩
বাংলাদেশ	১.০২	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫.০২
মিয়ানমার	০.৮৬	পেরু	৪.৭৯
কম্বোডিয়া	০.৪৯	রাশিয়ান ফেডারেশন	৪.১৭
ইন্দোনেশিয়া	০.৪৬	ভারত	৩.৫০
উগান্ডা	০.৪০	জাপান	৩.৪৩
নাইজেরিয়া	০.৩৪	ভিয়েতনাম	২.৬১
তানজানিয়া	০.৩১	নরওয়ে	২.২৯
রাশিয়ান ফেডারেশন	০.২৯	ফিলিপাইন	১.৯৫
অন্যান্য দেশ	৩.৬৭	অন্যান্য দেশ	৩২.০৬
মোট	**১১.৪৭**	**মোট**	**৮১.১৬**

উৎস : Food and Agricultural Organization, 2017

বিশ্বের প্রধান মৎস্যক্ষেত্র : বিশ্বের প্রধান মৎস্যক্ষেত্রসমূহ কতিপয় অঞ্চলে অবস্থিত (চিত্র ৫.৫.১)। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো:

১. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র : ভারত মহাসাগরের উত্তর ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত এ মৎস্যক্ষত্রটির আয়তন ৬৩০.১৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মৎস্যক্ষেত্র। এখানে ধৃত মৎস্যসমূহের মধ্যে স্যামন, ম্যাকারেল, ইলিশ, কোরাল, ভেটকি, পোয়া, চান্দা, রূপচান্দা, গলদা চিংড়ি অন্যতম। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, চীন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ এ মৎস্যক্ষেত্র থেকে মৎস্য শিকার করে। এ অঞ্চলের দেশসমূহে অধিক জনসংখ্যা থাকায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে কয়েকটি দেশ সামান্য পরিমাণে মৎস্য রপ্তানি করে থাকে।

২. এশিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র : পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মৎস্যক্ষেত্র এশিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূল। এ অঞ্চলটি প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত এবং জাপানের চতুর্দিকে অবস্থিত হওয়ায় এটি উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় বা জাপান উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। এ মৎস্যক্ষেত্রটির আয়তন প্রায় ২০৪.৭৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ধৃত মৎস্যসমূহের মধ্যে রয়েছে কর্ড, হেরিং, স্যামন, হ্যালিবার্ট, ম্যাকারেল, সার্ডিন, টুনা, পিলচার্ড, রেডফিশ, রেফিশ প্রভৃতি। এছাড়া তিমি, হাঙ্গর, অক্টোপাস, ঝিনুক, কাকড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়। চীন, জাপান, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, উত্তর কোরিয়া, ফিলিপাইন, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ এ মৎস্যক্ষেত্রে মৎস্য শিকার করে থাকে। এ মৎস্যক্ষেত্র থেকে চীন সবচেয়ে বেশি মৎস্য শিকার করে। যা এদেশকে মৎস্য আহরণে বিশ্বে শীর্ষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। এ অঞ্চলের দেশসমূহে অভ্যন্তরীণ চাহিদা অধিক হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববাজারে মৎস্য রপ্তানি করে থাকে। এছাড়া মৎস্য আহরণকারী দেশসমূহ প্রক্রিয়াজাত মৎস্য এবং মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে।

৩. ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র : এটি আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মৎস্যক্ষেত্রটি উত্তরে শ্বেত সাগর থেকে দক্ষিণে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত। এর আয়তন ১৬৮.৭৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। মৎস্য চারণের জন্য ক্ষেত্রটি অত্যন্ত উপযোগী এবং কয়েকটি সমচূড়ার সমন্বয়ে গঠিত এক বিস্তৃত মহীসোপান। এখানে ধৃত মৎস্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো হ্যারিং, হেকস, হ্যাডক, ম্যাকারেল, হ্যালিবার্ট, ডগফিশ, রেডফিশ, গলদা চিংড়ি। এছাড়া তিমি, হাঙ্গর, ঝিনুক প্রভৃতি পাওয়া যায়। নরওয়ে, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি প্রভৃতি দেশ এ মৎস্যক্ষেত্র থেকে মৎস্য শিকার করে। এ অঞ্চলে মৎস্য আহরণকারী দেশসমূহের অর্থনীতিতে মৎস্যের গুরুত্ব অপরিসীম। নরওয়ে, আইসল্যান্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের অর্থনীতি মৎস্যের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

চিত্র ৫.৫.১ : বিশ্বের প্রধান মৎস্যক্ষেত্র

৪. দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র : এ মৎসক্ষেত্রটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে গড়ে উঠেছে। এর আয়তন ৮৬.১০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ধৃত মৎস্যসমূহের মধ্যে টুনা, হেরিং, পিলচার্ড, এস্কোবেট অন্যতম। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র থেকে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি, পেরু, ইকুয়েডর প্রভৃতি দেশ মৎস্য শিকার করে। এ মৎস্যক্ষেত্র থেকে সবচেয়ে বেশি মৎস্য শিকার করে চিলি। মৎস্য আহরণকারী দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা অধিক হওয়ায় স্বল্প পরিমাণে মৎস্য রপ্তানি করে। মৎস্য রপ্তানিকারক দেশসমূহের মধ্যে চিলি, পেরু ও ব্রাজিল অন্যতম।

৫. উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র : উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের আলাস্কা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত মৎস্যক্ষেত্রটি বিস্তৃত। এর আয়তন ৭৫.০৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এ মৎস্যক্ষেত্রটি থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা মৎস্য শিকার করে থাকে। এখানকার উল্লেখযোগ্য মৎস্য হলো স্যামন, হেরিং, ম্যাকারেল, হ্যালিবাট, কর্ড, সার্ডিন, গলদা চিংড়ি, টোনা, পিলকার্ড, হ্যাডক প্রভৃতি। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক হ্যালিবাট মাছ এ মৎস্যক্ষেত্র থেকে আহরণ করা হয়। এ অঞ্চলে মৎস্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভিক্টোরিয়া, ভ্যাঙ্কুভর, পোর্টল্যান্ড, প্রিন্স রূপার্ট, লস এঞ্জেলস, সিয়াটল, সানদিয়াগো প্রভৃতি বন্দর।

সারণি ৫.৫.৩ : বিশ্বের প্রধান সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের আয়তন

মৎস্যক্ষেত্রের নাম	আয়তন (লক্ষ বর্গকিলোমিটার)	মোট আয়তনের শতকরা হার (%)
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল	৬৩০.১৫	১৯.৬৩
এশিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল	২০৪.৭৬	৬.৩৮
ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল	১৬৮.৭৭	৫.২৬
দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলীয় অঞ্চল	৮৬.১০	২.৬৮
উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল	৭৫.০৩	২.৩৪
উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল	৫২.০৭	১.৬২
অন্যান্য অঞ্চল	১৯৯৩.৭২	৬২.০৯
মোট	**৩২১০.৬০**	**১০০.০০**

উৎস : FAO Year Book of Fishing Statistics-1999

৬. উত্তর-আমেরিকার পূর্ব-উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র : এ মৎস্যক্ষেত্রটি উত্তর-আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ক্যারেলিনার হ্যাটেরাস অন্তরীপ থেকে শুরু করে লাব্রাডরের উত্তর উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। এর আয়তন ৫২.০৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এখানে গভীর মগ্নচূড়া থেকে অধিক মৎস্য ধৃত হয়। এ মৎস্যক্ষেত্র থেকে কড, হেরিং, হ্যাডক, রোজফিশ, হ্যালিবাট, ফ্লাটফিশ, চিংড়ি প্রভৃতি শিকার করা হয়। এখানে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কর্ড মাছ। এছাড়া মেন হ্যাডেন নামক এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়। এটি দিয়ে জমিতে ব্যবহারের জন্য এক ধরনের সার তৈরি করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এ মৎস্যক্ষেত্র থেকে মৎস্য শিকার করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, পোর্টল্যান্ড, নিউইয়র্ক, কানাডার মন্ট্রিল, হ্যামিলটন, হ্যালিফ্যাক্স, সেন্টজন প্রভৃতি বন্দর মৎস্য ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

৭. অন্যান্য মৎস্যক্ষেত্র : অন্যান্য মৎস্যক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আমেরিকা, ক্যারাবীয় সাগর, ভূ-মধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল প্রভৃতি। এ ধরনের মৎস্যক্ষেত্রসমূহের আয়তন প্রায় ১৯৯৩.৭২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এসব মৎস্যক্ষেত্র থেকে সাধারণত স্যামন, ম্যাকারেল, টুনা, হ্যারিং, পিলচার্ড, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়।

মৎস্য চাষ ও এর উদ্দেশ্য : মানুষ যখন প্রয়োজনের তাগিদে অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায়ে মৎস্যের প্রজনন, বংশ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও লালন-পালন করে থাকে, তখন তাকে মৎস্য চাষ বলে। প্রাকৃতিক মৎস্যের স্বল্পতা দেখা দেওয়ায় মৎস্য চাষ দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। প্রধানত দুইটি উদ্দেশ্য মৎস্য চাষ করা হয়। যথা-জীবিকানির্বাহ ভিত্তিক মৎস্য চাষ এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ।

১. জীবিকানির্বাহ ভিত্তিক মৎস্য চাষ : সাধারণত নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য যে মৎস্যের চাষ করা হয় তাই হলো জীবিকানির্বাহ ভিত্তিক মৎস্য চাষ। এ ধরনের চাষের আওতাভুক্ত মৎস্যসমূহের মধ্যে রুই, কাতলা, পাবদা, কই, শিং, মাগুর, ভেটকি, পাইক, স্টারজেন, বিভিন্ন ধরনের কার্প জাতীয় মৎস্য অন্যতম। এশিয়া মহাদেশের প্রায় সর্বত্রই এ ধরনের মৎস্য চাষ দেখা যায়। এ ধরনের মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত মৎস্য বাজারে বিক্রি করা হয়।

২. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ : বিক্রির উদ্দেশ্য যে মৎস্য চাষ করা হয় তাই হলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ। এ ধরনের মৎস্য চাষের বিশেষ লক্ষ্য থাকে বিদেশে রপ্তানি করা। যেমন-বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ।

মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ : বিশ্বে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত মৎস্যের পাশাপাশি চাষকৃত মৎস্যের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মৎস্যের প্রাকৃতিক উৎসসমূহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় মৎস্য চাষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই বিশ্বব্যাপী মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. অতিমাত্রায় মৎস্য ধরা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. প্রজনন মৌসুমে মৎস্য ধরা বন্ধ রাখা;
৩. অপরিণত মৎস্য না ধরা;
৪. মিহি জালের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;
৫. মৎস্যের অতিরিক্ত ব্যবহার না করা;
৬. মৎস্যের স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখা;
৭. মৎস্যের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৮. পানি দূষণ প্রতিরোধ করা;
৯. মৎস্য চাষের জন্য দ্রুত বর্ধনশীল পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত আবিষ্কার করা এবং
১০. মৎস্যের গবেষণা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিশ্বের প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রসমূহ মানচিত্রে চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

মানুষের দৈনন্দিন প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মৎস্য। মৎস্য প্রধানত দুইটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। যথা-স্বাদু পানির মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, হাওড়, বাওড়, হ্রদ প্রভৃতি থেকে যেসব মৎস্য পাওয়া যায় সেগুলো স্বাদু পানির মৎস্য। যেমন-রুই, কাতলা, কই, মাগুর, শিং ইত্যাদি। অন্যদিকে, সমুদ্রে যেসব মৎস্য পাওয়া যায়

সেগুলোকে সামুদ্রিক মৎস্য বলে। কড, হেরিং, পিলচার্ড, সার্ডিন প্রভৃতি সামুদ্রিক মৎস্যের উদাহরণ। বিশ্বের প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- এশিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র, ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল, উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল, উত্তর আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলীয় অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চল এবং অন্যান্য অঞ্চল। বিশ্বব্যাপী যে মৎস্যক্ষেত্রগুলো রয়েছে সেগুলো প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির চাহিদা পূরণের জন্য মৎস্য চাষ প্রসারিত হচ্ছে। সাধারণত দুইটি উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষ করা হয়। প্রথমত, জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। বিশ্বের বহু মানুষ মৎস্য শিকার এবং চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আবার কোনো কোনো দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে উঠেছে মৎস্যকে কেন্দ্র করে। তাই বিশ্বব্যাপী মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মৎস্যের উৎসকে প্রধানত কতভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ থেকে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মানুষের প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মৎস্য। বিশ্বে স্বাদু এবং লবণাক্ত উভয় প্রকার পানি মৎস্য পাওয়া যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বহুবিধ কারণে মৎস্যের প্রাকৃতিক উৎসগুলো সংকুচিত হওয়ায় মৎস্য চাষ প্রসার লাভ করছে।

২। পৃথিবীর মোট আয়তনের কত শতাংশ পানি দ্বারা আবৃত?

(ক) ৪১% (খ) ৫১% (গ) ৬১% (ঘ) ৭১%

৩। স্বাদু পানির মৎস্যের উদাহরণ-

i. রুই ii. কড iii. বোয়াল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। আয়তনে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মৎস্যক্ষেত্র কোনটি?

(ক) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল (খ) এশিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল

(গ) দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলীয় অঞ্চল (ঘ) ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল

পাঠ-৫.৬ বিশ্বের পশুপালন (Animal Rearing of the World)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পশুপালন বলতে কী বুঝায় তা জানবেন;
- পশুপালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বিশ্বব্যাপী পশুপালন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

পশুপালন

মানুষের প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম ক্ষেত্র পশুপালন। মানব সভ্যতার সাথে পশু শিকার এবং পালনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আদিকালে মানুষ জীবনধারণের জন্য বন্যপ্রাণি শিকার করে মাংস আহার করতো এবং চামড়া পরিধান করতো। পরবর্তীতে মানুষ যখন পশুকে বশে আনতে সক্ষম হয়, তখন নিজের প্রয়োজনের তাগিদে পশুপালন শুরু করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে পশুপালন এক নব দিগন্তের সূচনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে পশুপালনের পরিধিও বাড়তে থাকে। বর্তমানে পশুপালনের মাধ্যমে বিশ্বের বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। অনেক দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশুপালন করা হয়। পৃথিবীর যেসব এলাকায় তৃণভূমি আছে সেসব এলাকায় ব্যাপকভাবে পশুপালন করা হয়। মহাদেশ হিসেবে পশুপালনে এশিয়া বিশ্বে প্রথম, দক্ষিণ আমেরিকা দ্বিতীয়, আফ্রিকা তৃতীয়, ইউরোপ চতুর্থ, উত্তর আমেরিকা পঞ্চম এবং অস্ট্রেলিয়া ষষ্ঠ অবস্থানে। মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী এন্টার্কটিকা মহাদেশ বরফাচ্ছন্ন থাকায় এখানে পশুপালন হয় না।

পশুপালনের গুরুত্ব (Importance of Animal Rearing) : পশুপালনের মাধ্যমে মাংস ও দুধ পাওয়া যায় যা আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। এছাড়া পশুর চামড়া এবং লোম দিয়ে যথাক্রমে চামড়া ও পশম শিল্প গড়ে উঠেছে। চামড়া এবং লোম প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন ধরনের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরি করা হয়। পশম শিল্পে উৎপাদিত পশমী বস্ত্র শীতপ্রধান দেশের অন্যতম পরিধেয় হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া পশুর হাড়, শিং, দাঁত প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শিল্পে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষিকাজের জন্য গরু-মহিষের অধিক ব্যবহার দেখা যায়। বিশ্বের অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে কৃষিকাজের অনুপযোগী জলবায়ু থাকলেও তৃণভূমির জন্য বিখ্যাত। এসব অঞ্চলের মানুষ পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া কৃষিপ্রধান দেশসমূহে পশুপালনের মাধ্যমে বহু মানুষ জীবিকানির্বাহ করে। অনেক দেশ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশুপালন করে থাকে।

বিশ্বের পশুপালন : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের পশুপালন করা হয়। এসব পশুর মধ্যে রয়েছে গবাদি পশু, মেষ, ছাগল, শুকর, উট, দুম্বা ইত্যাদি। নিম্নে বিশ্বের প্রধান প্রধান পশুপালন সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

গবাদি পশুপালন (Cattle Rearing) : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের উপজীবিকার অন্যতম উপায় গবাদি পশুপালন। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনভূমি ও মেরু অঞ্চল ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই গবাদি পশুপালন করা হয়। গবাদি পশুর মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, মেরীগাই, ষাঁড়, ইয়াক ইত্যাদি। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গবাদি পশুপালনের জন্য অনুকুল জলবায়ু, বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, পর্যাপ্ত শ্রমিক, উন্নত বাজার ব্যবস্থা, সুষ্ঠু পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় নিয়ামক। দুধ, মাংস এবং চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

গবাদি পশুপালনের উদ্দেশ্য : বহুবিধ উদ্দেশ্যে গবাদি পশুপালন করা হয়। এ সকল উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম হলো-

১. মাংস উৎপাদন : গবাদি পশুপালনের অন্যতম উদ্দেশ্য মাংস উৎপাদন। শীতল, শুষ্ক ও সমভাবাপন্ন জলবায়ু এবং বিস্তীর্ণ তৃণযুক্ত অঞ্চল মাংস উৎপাদনকারী গরু পালনের জন্য বিশেষ উপযোগী। মাংস উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রজাতির গরুর মধ্যে রয়েছে হিয়ার ফোর্ড, শর্ট হর্ণ ব্রাফোর্ড, ডেভন ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশ অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে প্রচুর পরিমাণে মাংস রপ্তানি করে থাকে।

২. দুগ্ধ উৎপাদন : গবাদি পশুপালনের আরেকটি অন্যতম লক্ষ্য দুগ্ধ উৎপাদন। দুগ্ধ সরাসরি পান করা ছাড়াও ঘি, মাখন, পনির প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনকে কেন্দ্র করে বিশ্বের অনেক অঞ্চলে দুগ্ধ শিল্প গড়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশ দুগ্ধ উৎপাদনে প্রসিদ্ধ।

৩. জমি চাষ ও ভারবহন : তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই জমি চাষ ও ভারবহনে গবাদি পশুপালন করে থাকে। তবে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে অনুন্নত দেশগুলোতেও জমি চাষ ও ভারবহনে গবাদি পশুর ব্যবহার প্রবণতা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

৪. চামড়া উৎপাদন বৃদ্ধি : গবাদি পশুর চামড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র (যেমন-ব্যাগ, জুতা) প্রস্তুত করা হয়। ফলে গবাদি পশুপালনের উদ্দেশ্যের মধ্যে চামড়া উৎপাদন বৃদ্ধি অন্যতম।

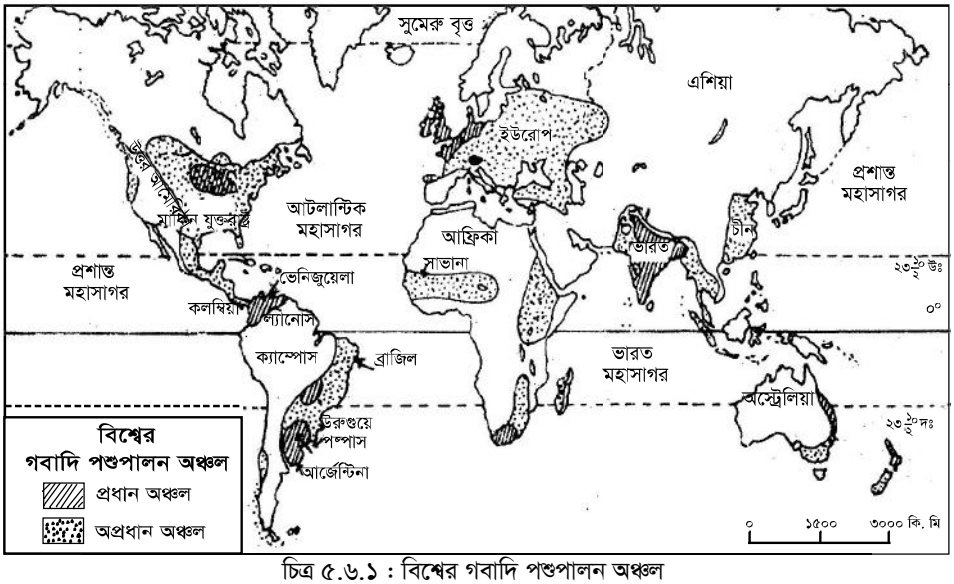

চিত্র ৫.৬.১ : বিশ্বের গবাদি পশুপালন অঞ্চল

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবাদি পশুপালন : বিশ্বের প্রায় সর্বত্র গবাদি পশুপালন হলেও কয়েকটি দেশ প্রসিদ্ধ। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইথিওপিয়া, সুদান, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি। এছাড়া বাংলাদেশ, রাশিয়া, উগান্ডা, কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশুপালন করা হয়। মহিষ পালনকারী দেশসমূহের মধ্যে পাকিস্তান, চীন মিসর, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ অন্যতম। সারণি ৫.৬.১ এ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবাদি পশুর সংখ্যা দেখানো হলো।

সারণি ৫.৬.১ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবাদি পশুর সংখ্যা (মিলিয়ন)

দেশ	গবাদি পশুর সংখ্যা	দেশ	গবাদি পশুর সংখ্যা
ভারত	৩০২.৬০	রাশিয়া	১৮.৮৮
ব্রাজিল	২১৯.১৮	মেক্সিকো	১৬.৬১
চীন	১০০.২৮	তুরস্ক	১৪.১৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৯১.৯২	কানাডা	১২.০৩
আর্জেন্টিনা	৫২.৫৭	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন	৮৯.১৫
অস্ট্রেলিয়া	২৭.৪১	অন্যান্য দেশ	৪৩.৮৪
মোট	**৯৮৮.৬০**		

উৎস : United States Department of Agriculture (USDA), 2017

মেষ পালন (Sheep Rearing) : বিশ্বে পশুপালনের অন্যতম ক্ষেত্র মেষ। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের কৃষিকাজের অনুপযোগী অনাবাদী বন্ধুর ভূমিতে অধিক সংখ্যক মেষ পালন করা হয়। এছাড়া উষ্ণ বা ক্রান্তীয় অঞ্চলেও মেষ পালন করা হয়। মেষ খাদ্য হিসেবে ক্ষুদ্রাকৃতির তৃণ খেয়ে থাকে।

মেষ পালনের উদ্দেশ্য : মেষ পালনের উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

১. মাংস উৎপাদন : মেষ পালনের প্রধান উদ্দেশ্য মাংস উৎপাদন। কোনো কোনো জাতের মেষ শুধুমাত্র মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। যেমন-রোমনে মেষ, লিঙ্ক মিষ, মার্শ মেষ।

২. পশম উৎপাদন : মেষ পালনের মাধ্যমে পশম উৎপাদন করা হয়। কোনো কোনো জাতের মেষ শুধুমাত্র পশম উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। যেমন-মেরিনো। অনুকূল জলবায়ু থাকায় উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধে পশম প্রদায়ী মেষ অধিক পালন করা হয়।

৩. দুগ্ধ উৎপাদন : কোনো কোনো স্থানে মেষ পালন করে সামান্য পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায়। তবে শুধুমাত্র দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য মেষ পালন করা হয় না।

৪. মাংস ও পশম উৎপাদন : কোনো কোনো মেষ মাংস এবং পশম উভয়টি উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়। যেমন-ইংলিশ মেষ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মেষ পালন : বিশ্বে মেষ পালনকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য। এছাড়া রাশিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, পেরু, ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে মেষ পালন করা হয়।

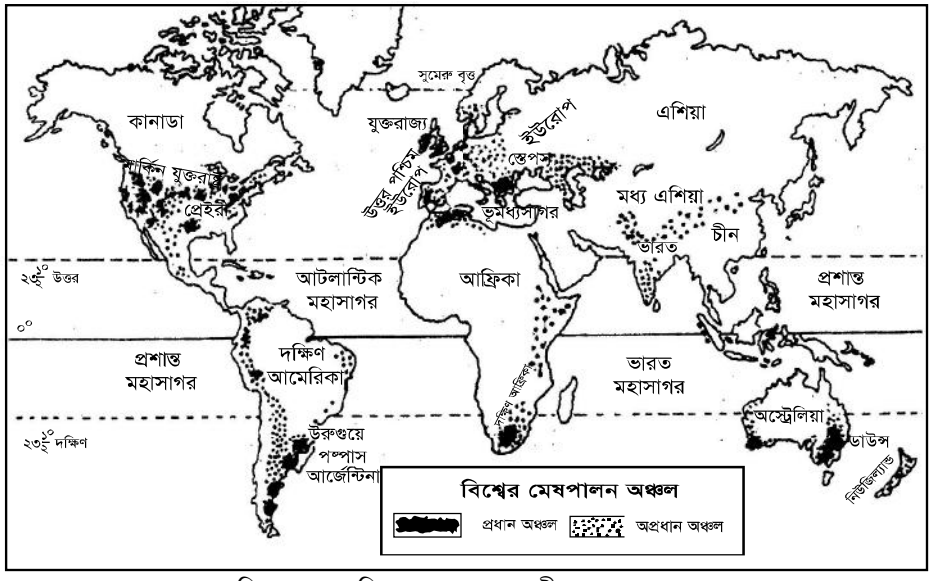

চিত্র ৫.৬.২ : বিশ্বের মেষ পালনকারী প্রধান দেশসমূহ

ছাগল পালন (Goat Rearing) : মেষের পরই ছাগল পালনের স্থান। এটি কষ্ট সহিষ্ণু প্রাণি হওয়ায় সহজেই পালন করা যায়। সাধারণত ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে অনুকূল পরিবেশের কারণে অধিক পরিমাণে ছাগল পালন করা হয়।

ছাগল পালনের উদ্দেশ্য : গবাদি পশু ও মেষ পালনের ন্যায় ছাগল পালনের উদ্দেশ্য মাংস, দুগ্ধ ও চামড়া উৎপাদন। তবে বেশির ছাগল পালন করা হয় মাংস এবং চামড়ার জন্য।

ছাগল পালনকারী দেশসমূহ : ছাগল পালনকারী দেশসমূহের মধ্যে ভারত, চীন, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ, ইরান, তুরস্ক, সুদান, ইউক্রেন অন্যতম।

শুকর পালন (Swine Rearing) : শুকর যেকোনো জলবায়ুতে জীবনধারণ করতে পারে। স্ত্রী শুকর একই সাথে অনেক বাচ্চা জন্ম দেয় বলে উৎপাদন খরচ অনেক কম। এটি ময়লা-আবর্জনা খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে। ফলে এর জন্য বিশেষ কোনো পরিবেশ প্রয়োজন হয়না। ভুট্টা, আলু, রাই প্রভৃতি খাওয়ালে মাংস ও চর্বি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

শুকর পালনের উদ্দেশ্য : শুকর পালনের প্রধান উদ্দেশ্য মাংস ও চর্বি।

শুকর পালনকারী দেশসমূহ : শুকর পালনে চীন বিশ্বে প্রথম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, জার্মানি, রাশিয়া, মেক্সিকো, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, জাপান, কানাডা, ফিলিপাইন শুকর পালনে প্রসিদ্ধ।

উট ও দুম্বা পালন (Camel and Thick Tailed Sheep) : উট এবং দুম্বা মরুভূমি অঞ্চলে পালন করা হয়। প্রাণি দুটি অধিক তাপ সহ্য করতে পারে বলে মরু অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে। মরুভূমিতে বালি ঝড়ের সময় তাপ সহ্য করে এসব প্রাণির দেহের আড়ালে যাত্রীরা আশ্রয় নিয়ে নিজেদের রক্ষা করে।

উট ও দুম্বা পালনের উদ্দেশ্য : মরুভূমি অঞ্চলে যাত্রী ও ভার বহনের জন্য উট ব্যবহার করা হয়। উট থেকে মাংস ও দুধ পাওয়া যায়। এছাড়া উটের লোম থেকে এক ধরনের মোটা পশম তৈরি করা হয়। অন্যদিকে দুম্বা থেকে মাংস পাওয়া যায়। মরুভূমি অঞ্চলের যাযাবর লোকজনের প্রধান লক্ষ্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুম্বা পালন।

উট ও দুম্বা পালনকারী দেশসমূহ : সৌদি আরব, ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ।
উপরিউক্ত পশুসমূহ ছাড়াও হাতি, ঘোড়া, হরিণ, গর্দভ, খচ্চর, বলগা, কুকুর প্রভৃতি পালন করা হয়। মানুষ এসব পশুকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	গবাদি পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত পশুপালন। জলবায়ু এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের পশুপালন করা হয়। এসব পশুর মধ্যে রয়েছে গবাদি পশু, মেষ, ছাগল, শুকর, উট, দুম্বা প্রভৃতি। বিশ্বের পশুপালনকারী দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, পেরু, ইরান, সৌদি আরব, তুরস্ক, সুদান, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি। এছাড়া প্রায় সব দেশেই কম-বেশি বিভিন্ন ধরনের পশুপালন করা হয়। পশুপালনের মাধ্যমে মাংস, দুগ্ধ, চামড়া প্রভৃতির চাহিদা মেটানো হয়। দুগ্ধ, চামড়া ও পশম প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন প্রকার নিত্য ব্যবহার্য জিনিস প্রস্তুত করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পশুপালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিশ্বের কোন পশুটি সবচেয়ে বেশি পালন করা হয়?
(ক) গবাদি (খ) মেষ গ) ছাগল ঘ) শুকর

২। কোন পশুটি মরু অঞ্চলে পালন করা হয়?
(ক) গরু (খ) মহিষ (গ) ছাগল (ঘ) দুম্বা

৩। পশুপালনে বিশ্বে প্রথম কোন মহাদেশ?
(ক) ইউরোপ (খ) এশিয়া (গ) এন্টার্কটিকা (ঘ) আফ্রিকা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের প্রধান উপজীবিকা পশুপালন। অনেক দেশের অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি পশুপালন। এটি মানুষের আদিমতম পেশার একটি। যার পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। পশুপালন কোন পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড?
(ক) প্রাথমিক (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ

৫। পশুপালনের উদ্দেশ্য হলো-
i. মাংস ii. দুগ্ধ iii. চামড়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ধান Oryza বর্গের তৃণজাতীয় দানাদার ফসল। এটি বিশ্বের প্রায় অর্ধেকের বেশি মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য। মনুষ্য বসবাসকারী সব মহাদেশেই ধান জন্মে। তবে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ ধান উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ স্থানের অধিকারী। এসব ধান উৎপাদনকারী দেশের বেশিরভাগই উৎপাদিত ধানের বৃহৎ অংশ অভ্যন্তরীণ ভোগে ব্যবহার করে। আবার কোনো কোনো দেশ অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে প্রচুর পরিমাণে চাল রপ্তানি করে থাকে।

ক. কৃষিকাজ কোন পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড?

খ. কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বলতে কী বুঝায়?

গ. পৃথিবীর মানচিত্রে ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহ চিহ্নিত করুন।

ঘ. এশিয়া মহাদেশ ধান উৎপাদনে প্রথম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন -২

একসময় কৃষি সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি নির্ভর ছিল। সময়ের আবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধিতে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহ এগিয়ে রয়েছে। বর্তমানে অনেক দেশে বিভিন্ন কৃষিজ ফসল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষাবাদ করা হয়।

ক. কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকজনকে কী বলে?

খ. মৎস্য চাষ বলতে কী বুঝায়?

গ. ভারতের তুলনায় চীনে হেক্টর প্রতি অধিক ধান উৎপাদিত হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন -৩

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

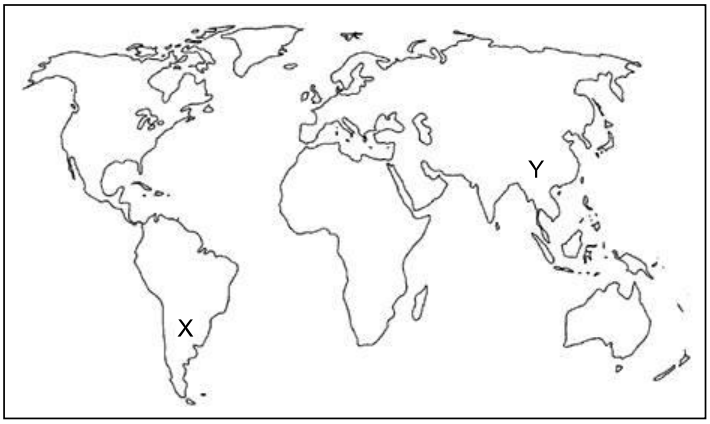

ক. চায়ের বৈজ্ঞানিক নাম কী?

খ. কৃষির আর্থ-সামাজিক নিয়ামকসমূহ উল্লেখ করুন।

গ. চিত্রে উল্লিখিত X এবং Y অঞ্চলে চা উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।

ঘ. চা চাষের প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১ : ১. ক ২. ক ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২ : ১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩ : ১. ক ২. খ ৩. ঘ ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪ : ১. গ ২. খ ৩. খ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৫ : ১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৬ : ১. ক ২. ঘ ৩. খ ৪. ক ৫. ঘ

পাঠ-৫.৭ স্তম্ভলেখ ও পাইচিত্রের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন প্রদর্শন ও প্রকৃতি ব্যাখ্যাকরণ (Presentation and Analyse of Agricultural Production through Bar Graph and Pie Graph)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্তম্ভলেখ এবং পাইচিত্রের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন প্রদর্শন করতে পারবেন।

স্তম্ভলেখ এবং পাইচিত্র

পরিসংখ্যানিক উপাত্ত মানচিত্রে প্রদর্শনের যেসব পদ্ধতি রয়েছে সেগুলোর মধ্যে বহুল ব্যবহৃত স্তম্ভলেখ এবং পাইচিত্র। এ দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে যেকোনো তথ্য সহজেই বুঝা যায়।

স্তম্ভলেখচিত্র : যখন কোনো উপাত্তকে তুলনা করার জন্য স্তম্ভের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে স্তম্ভলেখচিত্র বলে। এ ধরনের চিত্রে বিভিন্ন স্তম্ভের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হয়। তবে প্রতিটি স্তম্ভের প্রস্থের মান একই হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী আনুভূমিক বা উলম্ব স্তম্ভ লেখচিত্র অঙ্কন করা যায়।

স্তম্ভলেখ অঙ্কনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে-

১. স্তম্ভলেখ অঙ্কনের জন্য ছক কাগজ ব্যবহার করলে স্তম্ভের রেখাগুলো সোজা হয় এবং চিত্রটি সুন্দর দেখায়।
২. প্রদত্ত সংখ্যাগুলো ক্রম অনুসারে অর্থাৎ ৫, ৭, ২, ৩ থাকলে ৭, ৫, ৩, ২ এভাবে সাজিয়ে নিলে চিত্রটি সুন্দর দেখায়।
৩. চিত্র অঙ্কনের জন্য স্কেল নিলে ভালো হয়। একক নির্ণয়ের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, লেখচিত্রে দীর্ঘতম স্তম্ভটি যেন কাগজে সীমারেখার মধ্যেই স্থান পায় এবং ক্ষুদ্রতম স্তম্ভটি তুলনামূলকভাবে খুব ক্ষুদ্র না হয়ে সহজেই দেখা যায়।
৪. প্রতি এক ইঞ্চি বা অর্ধ ইঞ্চি পর পর এককগুলো চিত্রের একপার্শ্বে ছক কাগজে চিহ্নিত করতে হয়।
৫. প্রাপ্ত সংখ্যাগুলো একক অনুসারে হিসাব করে স্তম্ভগুলোর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে।
৬. লেখচিত্রটিতে কী বিষয় দেখানো হয়েছে তা চিত্রের উপরে বা নিচে সংক্ষেপে লিখে দিতে হয়।
৭. লেখচিত্রটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য অঙ্কনকারীর সৃজনশীলতার উপর নির্ভর করতে হয়। প্রয়োজনে বিভিন্ন ছায়াপাত বা রং ব্যবহার করে লেখচিত্রটিকে সুন্দর করা যায়।

অঙ্কন পদ্ধতি : স্তম্ভলেখচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রথমে উলম্ব এবং আনুভূমিক রেখা অঙ্কন করতে হবে। স্তম্ভলেখের উলম্ব পাশে **Y** অক্ষ এবং আনুভূমিক পাশে **X** অক্ষ ধরা হয়। এরপর উপাত্তের নাম, স্কেলসহ প্রয়োজনীয় তথ্য লিখতে হবে। অত:পর প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর একক অনুসারে হিসেব করে স্তম্ভগুলোর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে। প্রত্যেক স্তম্ভের প্রস্থ সমান হবে। কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য কম-বেশি হবে। ছক কাগজের বিস্তার অনুযায়ী স্তম্ভগুলোর প্রস্থ স্থির করতে হবে। স্তম্ভগুলো পৃথক পৃথকভাবে অথবা পরস্পর স্পর্শ করে অঙ্কন করা যায়। পৃথকভাবে বিন্যস্ত স্তম্ভগুলোর মধ্যবর্তী ব্যবধান সমান হবে। এভাবে একটি স্তম্ভলেখচিত্র অঙ্কন সমাপ্ত করতে হবে। অঙ্কনের সুবিধার জন্য স্কেলটি সবসময় নিকটস্থ পূর্ণ সংখ্যায় ধরতে হয়।

উদাহরণ : বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ধান উৎপাদন দেখানো হলো (সারণি ৫.৭.১)। প্রদত্ত তথ্যের আলোকে স্তম্ভলেখচিত্র অঙ্কন করতে হবে।

সারণি ৫.৭.১ : বিশ্বের প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশ ও উৎপাদন (মিলিয়ন টন)

দেশের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ	দেশের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ
চীন	১৪৫.৭৭	থাইল্যান্ড	১৫.৮০
ভারত	১০৪.৪১	মিয়ানমার	১২.১৬
ইন্দোনেশিয়া	৩৬.২০	ফিলিপাইন	১১.০০
বাংলাদেশ	৩৪.৫০	জাপান	৭.৬৭
ভিয়েতনাম	২৭.৫৮	ব্রাজিল	৭.২১

উৎস : United States Department of Agriculture (USDA), 2017

অঙ্কন পদ্ধতি : প্রথমে প্রদত্ত উপাত্তের সর্বোচ্চ সংখ্যা বের করে নিই। সারণি অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যা ১৪৫.৭৭ মিলিয়ন টন। এখন এমন একটি স্কেল নিতে হবে যার মধ্যে ৭.২১ থেকে ১৪৫.৭৭ মিলিয়ন টন সহজেই দেখানো যায়। অঙ্কনের

সুবিধার জন্য উৎপাদনের সর্বোচ্চ সংখ্যার নিকটস্থ পূর্ণসংখ্যা ধরি। অর্থাৎ ১ থেকে ১৫০ মিলিয়ন টন দেখিয়ে একটি স্কেল অঙ্কন করি। ধরি, স্কেলটির দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চি, যা ১৫০ মিলিয়ন টন নির্দেশ করে। অর্থাৎ ১ ইঞ্চি=৩০ মিলিয়ন টন। এখন ৫ ইঞ্চি বিশিষ্ট স্কেলটিকে ১৫টি ভাগে ভাগ করলে প্রতিভাগে ১০ মিলিয়ন টন হবে। এখন এ স্কেল অনুযায়ী প্রদত্ত উপাত্তের প্রতিটি দেশের উৎপাদনের পরিমাণের জন্য স্তম্ভের দৈর্ঘ্য কত হবে তা নির্ণয় করি।

১. চীন ১৪৭.৭৭ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×১৪৭.৭৭=৪.৯৩″

২. ভারত ১০৪.৪১ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×১৪৭.৭৭ =৩.৪৮″

৩. ইন্দোনেশিয়া ৩৬.২০ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×৩৬.২০=১.২১″

৪. বাংলাদেশ ৩৪.৫০ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×৩৪.৫০=১.১৫″

৫. ভিয়েতনাম ২৭.৫৮ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×২৭.৫৮=০.৯২″

৬. থাইল্যান্ড ১৫.৮০ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×১৫.৮০=০.৫৩″

৭. মিয়ানমার ১২.১৬ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×১২.১৬=০.৪১″

৮. ফিলিপাইন ১১.০০ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×১১.০০=০.৩৭″

৯. জাপান ৭.৬৭ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×৭.৬৭=০.২৬″

১০. ব্রাজিল ৭.২১ মিলিয়ন টন = $\frac{১}{৩০}$ ×৭.২১=০.২৪″

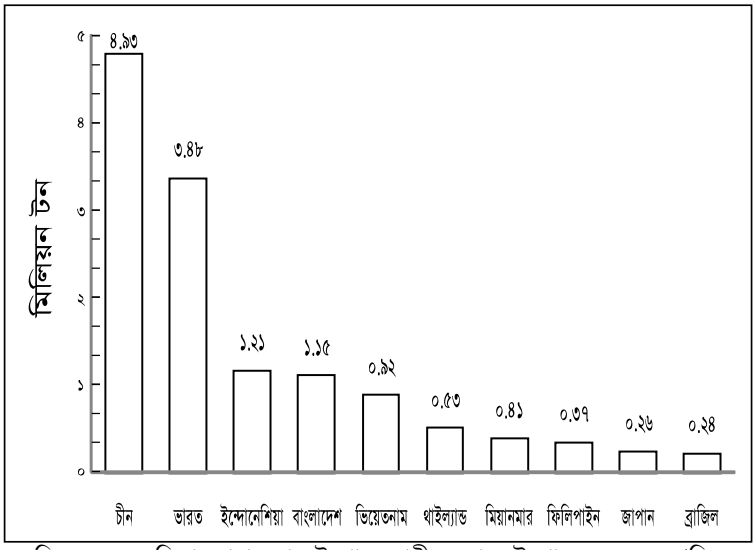

চিত্র ৫.৭.১ : বিশ্বের প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদনের স্তম্ভ লেখচিত্র

উৎপাদনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ : চিত্র ৫.৭.১ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এশিয়া মহাদেশে সর্বাধিক ধান উৎপাদিত হয়েছে। আবার এ মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে চীনে সর্বোচ্চ ধান উৎপাদিত হয়েছে। এ কারণে স্তম্ভলেখটি উপরের দিকে সর্বোচ্চ উত্থিত। এরপরই রয়েছে ভারতের স্তম্ভলেখটি। সবচেয়ে নিচু স্তম্ভলেখটি ব্রাজিলের। চিত্রটি

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধান উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থানে চীন এবং সর্বনিম্ন স্থানে ব্রাজিল। বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ।

শিক্ষার্থীর কাজ	২০১৫-১৬ অর্থবছরে কতিপয় দেশের গম উৎপাদন (মিলিয়ন টন) দেখানো হলো। প্রদত্ত তথ্যের আলোকে স্তম্ভ লেখচিত্র অঙ্কন করে উৎপাদনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

দেশ	উৎপাদনের পরিমাণ	দেশ	উৎপাদনের পরিমাণ
চীন	১৩০.১৯	পাকিস্তান	২৫.১০
ভারত	৮৬.৫৩	অস্ট্রেলিয়া	২৪.১৭
রাশিয়া	৬১.০৪	তুরস্ক	১৯.৫০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫৬.১২	আর্জেন্টিনা	১১.৩০
কানাডা	২৭.৫৯	কাজাকিস্তান	১৩.৭৫
ইউক্রেন	২৭.২৭	মিশর	৮.১০

উৎস : United States Department of Agriculture, 2017

পাইচিত্র বা চক্রলেখ : যখন কোনো উপাত্তকে বৃত্তের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তখন তাকে পাইচিত্র বা চক্রলেখ বলে। এর মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতিপয় তথ্য এবং ঐ তথ্যগুলোর সমষ্টির সাথে প্রতিটির সম্পর্ক দেখানো হয়। এক্ষেত্রে একটি পূর্ণ বৃত্তকে কয়েকভাগে বিভক্ত করে বৃত্তাংশগুলো দ্বারা বিভিন্ন তথ্য বুঝানো হয়। যেমন- কোনো স্থানের আয়তন, লোকসংখ্যা, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য, জমির পরিমাণ, বাজেটের বিভিন্ন খাতে আয়-ব্যয়, বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি। পাইচিত্র অঙ্কন করতে বৃত্তটির কোনো সঠিক ব্যাসার্ধ থাকে না। তবে কোনো স্থানের ভূমি ব্যবহার দেখানোর জন্য পাইচিত্র ব্যবহৃত হলে নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে সেই স্থানের আয়তন অনুযায়ী বৃত্ত অঙ্কন করে তা দেখাতে হয়।

পাইচিত্র অঙ্কনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে-

১. কাগজের আয়তনের তুলনায় বৃত্তটি খুব বড় বা ছোট যেন না হয়।

২. প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর সমষ্টি নির্ণয় করতে হয়। প্রদত্ত সংখ্যাগুলির সমষ্টি ৩৬০০ হবে। অত:পর প্রত্যেক সংখ্যার ডিগ্রির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। প্রত্যেক সংখ্যার জন্য চাঁদার সাহায্যে ডিগ্রির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে নিম্নোক্তভাবে-

'ক' সংখ্যা= $\frac{৩৬০ \times \text{ক সংখ্যা}}{\text{সমষ্টি}}$ =নির্ণেয় ডিগ্রি

৩. প্রত্যেক সংখ্যায় ডিগ্রি পরিমাপ নির্ণয় করা সম্পন্ন হলে সেগুলোর সমষ্টি ৩৬০০ হয় কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে। সামান্য কম-বেশি হলে সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে যোগফল ঠিক রাখতে হবে। ফলাফল ভগ্নাংশ হলে তা আসন্নপ্রায় পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করা যেতে পারে।

৪. বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত একটি উলম্ব রেখা নিতে হয়। একে ভূমিরেখারূপে ব্যবহার করে প্রথম কোণ, প্রথম কৌণিক রেখাকে ভূমিরূপে ব্যবহার করে দ্বিতীয় কোণ অঙ্কন করতে হয়। এইরূপ বৃত্তের কেন্দ্রে কোণগুলো অঙ্কন শেষ করতে হয়।

৫. সব সময় কোণগুলোকে দক্ষিণাবর্তে অঙ্কন করতে হয়।

৬. বৃত্তাংশগুলিকে বিভিন্ন রং বা ছায়াপাত দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।

৭. সাদা কাগজের উপর কালো চিত্র সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। রং ব্যবহার করতে হলে ফিকা রং ব্যবহার করা ভাল, এতে চিত্রটির সৌন্দর্য ফুটে উঠে।

পাইচিত্রের মাধ্যমে উপাত্ত উপস্থাপন : সারণি ৩.৭.১ এ প্রদত্ত দেশসমূহের ধান উৎপাদনের সমষ্টি ৪০২.৩ মিলিয়ন টন। আমরা জানি, একটি বৃত্ত এর কেন্দ্র ৩৬০° কোণ উৎপন্ন করে। সুতরাং দেশগুলোর ধান উৎপাদনের সমষ্টি ৩৬০°। এখন প্রত্যেকটি দেশের ধান উৎপাদনের প্রকৃতি দেখানোর জন্য ডিগ্রির পরিমাণ নির্ণয় করি এবং পূর্ণ সংখ্যায় ধরি। এরপর নির্ণয়কৃত ডিগ্রি ব্যবহার করে চাঁদার সাহায্যে পাইচিত্রে উপস্থাপন করি।

১. চীন ১৪৭.৭৭ মিলিয়ন টন= $\frac{৩৬০ \times ১৪৭.৭৭}{৪০২.৩}$ =১৩০.৪৪ বা ১৩০°

২. ভারত ১০৪.৪১ মিলিয়ন টন= $\frac{৩৬০ \times ১০৪.৪১}{৪০২.৩}$ =৯৩.৪৩১ বা ৯৩°

৩. ইন্দোনেশিয়া ৩৬.২০ মিলিয়ন টন= $\frac{৩৬০ \times ৩৬.২০}{৪০২.৩}$ =৩২.৩৯৩ বা ৩২°

৪. বাংলাদেশ ৩৪.৫০ মিলিয়ন টন= $\frac{৩৬০ \times ৩৪.৫০}{৪০২.৩}$ =৩০.৮৭২ বা ৩১°

৫. ভিয়েতনাম ২৭.৫৮ মিলিয়ন টন= $\frac{৩৬০ \times ২৭.৫৮}{৪০২.৩}$ =২৪.৬৮০ বা ২৫°

৬. থাইল্যান্ড ১৫.৮০ মিলিয়ন টন= $\frac{৩৬০ \times ১৫.৮০}{৪০২.৩}$ =১৪.১৩৮ বা ১৪°

৭. মিয়ানমার ১২.১৬ মিলিয়ন টন = $\frac{৩৬০ \times ১২.১৬}{৪০২.৩}$ =১০.৮৮১ বা ১১°

৮. ফিলিপাইন ১১.০০ মিলিয়ন টন = $\frac{৩৬০ \times ১১.০০}{৪০২.৩}$ =৯.৮৪৩ বা ১০°

৯. জাপান ৭.৬৭ মিলিয়ন টন = $\frac{৩৬০ \times ৭.৬৭}{৪০২.৩}$ =৬.৮৬৩ বা ৭°

১০. ব্রাজিল ৭.২১ মিলিয়ন টন = $\frac{৩৬০ \times ৭.২১}{৪০২.৩}$ =৬.৪৫১ বা ৭°

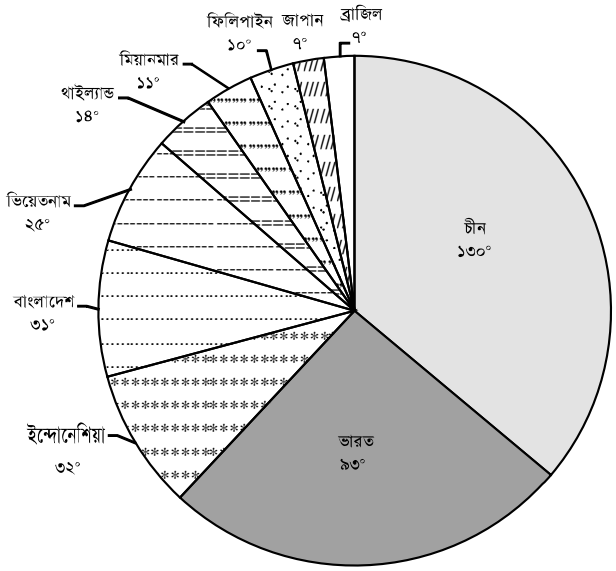

চিত্র ৫.৭.২ : বিশ্বের প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশের উৎপাদনের পাইচিত্র

উৎপাদনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ : চিত্র ৫.৭.২ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধান উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে চীন বৃত্তের ১৩০° স্থান দখল করে আছে। এরপর ভারত ৯৩°, ইন্দোনেশিয়া ৩২°, বাংলাদেশ ৩১°, ভিয়েতনাম ২৫°, থাইল্যান্ড ১৪° এবং অন্যান্য দেশ অবশিষ্ট স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ কারণে পাইচিত্রটিতে চীনের আকার সবচেয়ে বেশি, এরপরই রয়েছে ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশের অবস্থান। অর্থাৎ পাইচিত্রটি দেখে একথা বলা যায় যে, এশিয়ার দেশগুলোতে অধিকাংশ ধান উৎপাদিত হয়। এখানকার জলবায়ু, মৃত্তিকাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়ামক এবং চাহিদাসহ আর্থ-সামাজিক নিয়ামক ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ

প্রদত্ত সারণিতে বিগত কয়েকটি অর্থবছরে বাংলাদেশের পাট উৎপাদন দেখানো হলো। উক্ত তথ্যের আলোকে পাইচিত্র অঙ্কন করে উৎপাদনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

অর্থবছর	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	অর্থবছর	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)
২০০৫-০৬	৮.৩৬	২০১০-১১	১৫.২১
২০০৬-০৭	৮.৮৪	২০১১-১২	১৮.৭৮
২০০৭-০৮	৮.৩৭	২০১২-১৩	১৩.৮১
২০০৮-০৯	৮.৪৭	২০১৩-১৪	৭৪.৩৬
২০০৯-১০	৯.২২	২০১৪-১৫	৭৫.০১